Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতার করণীয় ও দায়িত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া চৌধুরী তিথি

রোলঃ 228020300

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতার করণীয় ও দায়িত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া চৌধুরী তিথি

রোলঃ 228020300

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতার করণীয় ও দায়িত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া চৌধুরী তিথি, আইডিঃ 228020300 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতার করণীয় ও দায়িত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sadia

(স্বাক্ষর)

সাদিয়া চৌধুরী তিথি

আইডিঃ 228020300

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সন্তান জন্মের পূর্বে ও পরে পিতা-মাতার করণীয় 2

সন্তান জন্মের পূর্বে মায়ের সতর্কতা 2

সন্তান জন্মের পূর্বে দু'আ 4

স্ত্রী-সহবাসের পূর্বে দু'আ এবং শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া 5

সন্তান জন্মের আগে মায়ের স্বাস্থ্যগত দায়িত্ব 6

সন্তান জন্মের পর প্রথম দিনের দায়িত্ব 7

সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনের দায়িত্ব...9

শিশু সন্তানকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা 11

সন্তান প্রতিপালনের সাথে আকীদা, ঈমান ও ইহসানের সম্পর্ক 11

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক:..16

আল্লাহর অফুরন্ত ভাণ্ডারের 18

দান ও দা'ওয়াহ: মানবতার প্রতি অবদান রাখা..19

সন্তানদের মাঝে সাহসিকতার বীজ বপন করুন 20

আযকারের প্রতি যত্নবান হোন..21

আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া 22

কুরআনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া...22

শিশুর সাথে খেলাধুলা করা...22

শিশুদের সাথে কথা বলা..23

সন্তানদের প্রতি করণীয় 24

উত্তম উপদেশ প্রদান 26

সুন্দর কথার সুফল ও অসুন্দর কথার কুফল শিক্ষাদান...35

সন্তানদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করা..44

সন্তানের সলাতের ট্রেনিং...46
ফরয ইবাদতের গুরুত্ব...47
ইসলামী বিনোদনের বিষয়ে সতর্কতা...48
সন্তানদের প্রতি আজেবাজে মন্তব্য না করা...48
সর্বশেষ কথা:...49

ভূমিকা

সন্তান প্রতিপালন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। পিতা-মাতার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, নিজ দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে বুঝে নিয়ে সচেতনভাবে তা পালন করা। প্রত্যেক পিতা-মাতা' রই উচিত সন্তানের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হওয়া। পিতা-মাতা'কে আদর্শ হিসেবে পাওয়া সন্তানের একটি অধিকার। শুধু পার্থিব শিক্ষা নয়; বরং পরকালে সাফল্য লাভের উপায়ও তারা সন্তানদেরকে শিক্ষা দেবেন। এ দায়িত্বটাও তাদেরই। সন্তানরা প্রতিনিয়ত তাদের পিতা-মাতা' কে দেখে শিখছে। পিতা-মাতা যত ভালো ভালো উপদেশই তাদের দেন না কেন, পিতা-মাতা নিজেরা কী করেন, সেটাই তাদের অনুকরণের বিষয়। সন্তান থাকলে পিতা-মাতা' র ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু থাকে না। পিতা-মাতা যা-ই করবে সবসময় তা তাদের নজর কাড়বে। কথা ও কাজে অসামঞ্জস্য থাকলে তা সন্তানের কাছে গ্রহনযোগ্যতা হারাবে। আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতা' কে পাঠিয়েছেন সন্তানের পথপ্রদর্শক হিসেবে। আর একারণেই ইসলামে পিতা-মাতাকে এত বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সন্তান জন্মের পূর্বে ও পরে পিতা-মাতার করণীয়

মুসলিম পিতা-মাতার ঘরে পাঠানোর মাধ্যমে একটি শিশুকে বিশেষ নি' মাহ্ দেওয়া হয় যা দ্বারা সে শৈশব থেকেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। অন্য সবকিছুর মতো এ নি' মাহর সঠিক ব্যবহারও সন্তানকে শিখিয়ে দিতে হয়।

"চামচে তুলে খাইয়ে দিলে, চামচের আকার-আকৃতি ছাড়া আর কিছুই শেখা হয় না।"

-ই.এম ফরস্টার

মুসলিম পিতা-মাতা'দের একটি বড় রকমের ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাদের অনেকেরই ধারণা, পিতা-মাতা হিসেবে তাদের দায়িত্ব অন্যান্য পিতা-মাতার মতোই-কেবল সন্তানের ভরণ-পোষণ করানো, স্কুলে পাঠানো আর তার সুন্দর ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা। নিঃসন্দেহে সন্তানের প্রতি মুসলিম পিতা-মাতা'দের কিছু বিশেষ দায়িত্ব আছে; ঠিক যেমন আগেকার রাজ-রাজাদের যুগে, রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের বিশেষ শিক্ষা দিয়ে ব্যতিক্রমীভাবে গড়ে তোলা হতো। সন্তানকে বিশেষ শিক্ষা দেয়া কোনো অযৌক্তিক দাম্ভিকতা নয়; বরং মুসলিম পিতা-মাতা হিসেবে নিজেদের বিশেষ দায়িত্বকে উপলব্ধি করে তা যথাযথভাবে পালন করার একটি পদক্ষেপ মাত্র।

সন্তান জন্মের পূর্বে মায়ের সতর্কতা

অতি দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাস্তবে দেখা গেছে যে প্রেগন্যান্ট মায়েরা নয় মাস দশ দিন (৪০ সপ্তাহ) সময় কাটায় অনৈসলামী কর্মকান্ড করেন। সন্তান আল্লাহ দিয়েছেন আমাদেরকে নিয়ামতস্বরূপ, এ জন্য আমাদের সবসময় মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা কিন্তু আমরা করি তার উল্টোটা। আল্লাহ তা'আলা যে সকল কাজ হারাম করেছেন এবং যেসকল কাজ করা পছন্দ করেন না সেগুলো আমরা প্রেগন্যান্ট অবস্থায় করে থাকি। তখন অবসর সময় কাটানোর জন্য দেখা গেছে অনেক মায়েরাই রিমোট হাতে টিভির সামনে বসে সময় কাটায়, অশ্লীল নাচ, গান, সিরিয়াল, নাটক, হিন্দি সিনেমা, ইত্যাদি উপভোগ করে থাকেন।

আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি যে, পেটে যে সন্তান আছে সে সবই শুনতে পায় এবং মায়ের কাজকর্ম বুঝতে পারে। একজন মা যদি ঠিক মতো পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করেন, এই সময় ভাল বই পড়েন, কুরআন তিলাওয়াত করেন, কুরআন তিলাওয়াত শুনেন, কুরআনের তরজমা শুনেন, হাদীস পড়েন, কুরআনের তাফসীর পড়েন, ইসলামিক লেকচার শুনেন এবং
দেখেন তাহলে সেই পেটের সন্তানের উপর কেমন শুভ প্রভাব পড়বে? আর তার ঠিক উল্টোটা যদি কোন মা করেন, ইসলাম যার অনুমোদন দেয় না তা করেন, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা করেন, নাবী মুহাম্মাদ এ যা অপছন্দ করেন বা করতে নিষেধ করেছেন তা ঐ গর্ভবতী মা করেন, তাহলে তার পেটের সন্তানের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়বে? একবার চিন্তা করি আল্লাহর দেয়া নিয়ামত পেটে নিয়ে আল্লাহর অপছন্দ সব কাজ করছি!

যিনি সন্তান দিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা এই সন্তান সুস্থ হবে নাকি অসুস্থ হবে? এই সন্তান শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকবে নাকি মরে যাবে? এই সন্তান বোবা হবে নাকি বিকলাঙ্গ হবে? এ সকল কিছু নির্ভর করছে মহান সৃষ্টিকর্তার উপর। তিনি চাইলে কাউকে সন্তান দেন আবার কাউকে সন্তান দেন না, আবার কাউকে ছেলে দেন আবার কাউকে মেয়ে দেন। তাই আমাদের সবসময় সন্তানের বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য চাওয়া উচিত, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, তাঁর পছন্দ মতো কাজকর্ম করা উচিত।

যদি নিজেকে কন্ট্রোল করা না যায় তাহলে বাসা থেকে TV'র dish অথবা cable-এর কানেকশন কেটে দেয়া উচিত। তাহলে মন চাইলেও অন্তত্পক্ষে অশ্লীল নাচ, গান, সিরিয়াল, নাটক, হিন্দি সিনেমা ইত্যাদি হারাম কাজ থেকে দূরে থাকা যাবে।

সন্তান জন্মের পূর্বে দু'আ

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার গর্ভে যা রয়েছে, তা আমি মুক্ত করে (জন্মের পর) আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম, সুতরাং আপনি আমা হতে তা গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (সূরা আলে ইমরান: ৩৫)

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান প্রদান করুন; নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরা আলে ইমরান ৩৪ ৩৮)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। (সূরা ফুরকান ২৫ঃ ৭৪)

স্ত্রী-সহবাসের পূর্বে দু'আ এবং শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া

শয়তান থেকে শিশুকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সহবাসের সময় দু'আ করা। কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে শয়তান। শয়তান ঘোষণা দিয়ে মানুষের সংগে শত্রুতা শুরু করেছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে জানিয়েছেন সে (শয়তান) আমাদের বিপথগামী করবে, জাহান্নামে নিয়ে ছাড়বে, সে একা যাবে না। শয়তানই মানুষের চির শত্রু। একজন সচেতন বা হিতাকাঙ্খী অভিভাবক হিসেবে সন্তানের জন্য প্রথম করণীয় হলো সন্তানটি যেন দুনিয়াতে আসার পরে এই দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় শত্রুর শত্রুতা থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। এর জন্য ব্যবস্থা নেয়া অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চেয়ে নেয়া।

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

অর্থঃ আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে তুমি যে সন্তান দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সন্তান জন্মের আগে মা-বাবার নৈতিক দায়িত্ব

১. মা-বাবা উভয়ে উত্তম ও ভাল কাজের নিয়্যত করা।

২. মা-বাবা উভয়ে হালাল উপার্জন করা।

৩. মা-বাবা উভয়ে হালাল খাবার খাওয়া।

৪. ওয়াক্ত মতো দৈনিক পাঁচ সলাত আদায় করা।

৫. সম্ভব হলে মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদ সলাত আদায় করা।

৬. সলাতের পর তাসবীহ পাঠ করা।

৭. দু'জনেই খুব বেশীবেশী ভাল কাজ করা।

৮. প্রতিদিন আল-কুরআন অর্থসহ তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করা।

৯. নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত শুনা।

১০. ইসলামের উপর অন্যান্য বই অধ্যয়ন করা।

১১. মানুষের সাথে আরো বেশী ভালো আচরণ করা।

১২. গরীবদের মাঝে দান-সদাকা করা।

১৩. গীবত বা পরনিন্দা, কুৎসা রটনা, অহংকার ও দাম্ভিকতাপূর্ণ অসুন্দর বা খারাপ কথা বলা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

১৪. টিভি/ইন্টারনেটে অশ্লীল নাচ, গান, সিরিয়াল, নাটক, সিনেমা না দেখা।

সন্তান জন্মের আগে মায়ের স্বাস্থ্যগত দায়িত্ব

১. ডাক্তার দ্বারা নিয়মিত চেকআপ করানোর চেষ্টা করা।

২. গর্ভবতীর উপর কোন প্রকার মানসিক বা দৈহিক চাপ সৃষ্টি না করা।

৩. পারিবারিক কলহ থেকে দূরে থাকা।

৪. সবার সাথে হাসি-খুশীভাবে কথা বলা।

৫. নিজের বাচ্চাদের মারধর না করা, তাদের সাথে ভাল আচরণ করা।

৬. মাঝেমধ্যে চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া।

৭. প্রতিদিন অবশ্যই গোসল করা এবং এবং শরীরের প্রতি যত্ন নেয়া।

৮. সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।

৯. এ সময় বেশীবেশী পানি পান করা।

১০. গর্ভাবস্থায় সব সময় ঢিলাঢালা পোশাক পরা।

১১. ঝগড়া-ঝাটি না করা, কাউকে গালাগালি না করা।

১২. রাগ কমিয়ে হাসিখুশী থাকার চেষ্টা করা।

সন্তান জন্মের পর প্রথম দিনের দায়িত্ব

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে অন্য কোন কথা বা শব্দ শিশুর কানে প্রবেশ করার পূর্বেই তার কানে আল্লাহর নাম প্রবেশ করানো উত্তম। তারপর যা করণীয় তা হলোঃ

১. দু'আ করা: শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং বদ নযর থেকে বেঁচে থাকার জন্য দু'আ করা। সন্তান জন্মগ্রহণের সময় যিনি কাছে থাকবেন তিনি সন্তানের জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

মারইয়াম (আ:)-এর মাতাও স্বীয় শিশু কন্যাকে ও তার ভবিষ্যৎ সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে সমর্পণ করেছিলেন জন্মের আগে। রসূল এগু বলেছেন, শয়তান প্রত্যেক শিশুকেই তার জন্মের সময় আঘাত করে, ওরই কারণে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠে। কিন্তু মারইয়াম ১৬৯ ও ঈসা ৬ এটা হতে রক্ষা পেয়েছিলেন। দু'আটি নিম্নরূপ:

إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيمِ

নিশ্চয় আমি তাকে ও তার সন্তানগণকে বিতারিত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম। (সূরা আলে ইমরান: ৩৬)

২. **শুকরিয়া আদায় করা:** সন্তান জন্মের সুসংবাদ শোনার পর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আয়িশা-এর নিকট সন্তান জন্মের সংবাদ আসলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন সন্তানটি সুস্থ-স্বাভাবিক কিনা। যদি বলা হতো হ্যাঁ তিনি বলতেন: 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন'। (সহীহ বুখারী)

৩. **আযান শোনানো**: নবজাতক সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক উভয়ের ক্ষেত্রেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ডান কানে আযান বলা সুন্নাত। এই সময় আযান মসজিদের মুয়াজ্জিনের মতো সুর করে জোরে জোরে দিতে হবে না, আযানের প্রতিটি শব্দ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে বললেই হবে।"আবু রাফে (রা:) বলেন, ফাতিমা এ হাসান ইবনে আলী এ-কে প্রসব করলে আমি রসুলুলাহ (স:) কে হাসানের কানে সলাতের আযানের অনুরূপ আযান দিতে দেখেছি।" (জামে আত-তিরমিযী, আবু দাউদ)

৪. **তাহনীক করা**: ভূমিষ্ট শিশুর মাতা সামান্য কোন মিষ্টি দ্রব্য চিবিয়ে রস বের করে শিশুকে মুখের লালার সাথে মিশ্রিত করে তা আঙ্গুল দ্বারা মুখের ভেতর জিহ্বার তালুতে লাগিয়ে দেয়া সুন্নাহ। (সহীহ বুখারী) তবে যাদের মুখে অসুখ রয়েছে বা যারা পান-সিগারেট খান তাদের এই কাজটি করা উচিত নয়।

দুধপান করানোঃ সন্তানের জন্য মায়ের পক্ষ থেকে প্রথম উপহার হলো মায়ের দুধ। এটি ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানের জন্য পরিপূর্ণ খাদ্য। এতে আল্লাহ তা'আলা শিশুর যা প্রয়োজন তার সকল উপাদান দিয়ে দিয়েছেন। আজকাল কিছু কিছু মায়েরা অনেক খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুকে এ দুধ পান করা থেকে বঞ্চিত করে থাকেন অর্থাৎ এখান থেকেই শুরু হয় মায়ের দ্বারা সন্তানের অধিকার হরণ। অথচ একটু চিন্তা করা উচিত- মায়ের স্তনে এ দুধ কে দিল? কেন দিল? কেন এ সময়ে দিল? কেন মায়ের স্তনে ন্যাচারালি অন্য সময়ে দুধ আসে না ইত্যাদি। সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার, এমন মায়েদের আচরণে লংঘিত হচ্ছেঃ ক) সন্তানের অধিকার। খ) মহান আল্লাহ তা'আলার আদেশ।

৫. **সন্তানের কল্যাণের জন্য পিতার দু'আ করা**: পিতা সন্তানের কল্যাণের জন্য বা বরকতের জন্য দু'আ করবে। যাতে সন্তান দ্বীনদার হয়, মেধাবী হয়, মুত্তাকী হয়। নাবী এ-এর কাছে নবজাতক শিশুকে নিয়ে আসা হতো তিনি তার জন্য দু'আ করতেন। (সহীহ বুখারী)

সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনের দায়িত্ব

৬. **উত্তম নাম রাখা:** সন্তান পুত্র বা কন্যা যাই হোক না কেন তাদের উত্তম ও সুন্দর অর্থবোধক নাম থাকা বাঞ্ছনীয়। এটি মা-বাবার কাছে সন্তানের হক। মুসলিম নামের বই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়া ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই শত শত নামের লিস্ট পাওয়া যাবে। সেখান থেকে বাছাই করে একটি সুন্দর অর্থবহ নাম রাখা উচিত। খুব ভালো হয় যে, কিছু নাম পছন্দ করে কোনো যোগ্য আলেমের কাছ থেকে যাচাই করে নেয়া। কারণ অনেক সময় অনলাইনে সঠিক তথ্য নাও থাকতে পারে। রসূলুল্লাহ বলেছেন:

কিয়ামাতের দিন তোমাদের ডাকা হবে তোমাদের স্ব-স্ব নাম ও বাবার নামসহ। অতএব তোমরা ভাল নাম রাখবে। (আবু দাউদ)

৭. **মাথার চুল কাটা:** সপ্তম দিনে শিশুর মাথার চুল কামিয়ে (মুণ্ডন) দেয়া শিশুর অধিকার। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) আলী ইবনে আবু তালিব (রা:)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
রসূল (স:) একটি ছাগল দিয়ে হাসানের আকীকা করেন এবং বলেনঃ হে ফাতিমা! তার মাথা কামাও এবং তার চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হল। (জামে আত-তিরমিযী)

কোন কোন ডাক্তার শিশুর মাথার চুল কামাতে নিষেধ করেন। যদিও মেডিকেল সায়েন্স অনুযায়ী এর কোন জোড়ালো ক্ষতিকারক কারণ নেই। যেসব ডাক্তারের ইসলামের সঠিক জ্ঞান নেই তারা হয়ত এই সুন্নাহ পালনে গুরুত্ব দেন না। চুল ছেটে দেয়ার ফলে শিশুর দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

৮. **আকীকা করা:** নবজাতক সন্তান ছেলে হলে দু'টি ছাগল অথবা ভেড়া আর কন্যা হলে একটি ছাগল অথবা ভেড়া তার নামানুসারে যবেহ করা উত্তম। আকীকা করতে হয় সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে, সেদিন সম্ভব না হলে ১৪তম দিনে এবং সেটিও সম্ভব না হলে ২১তম দিনে আকীকা দিতে হবে। এই কুরবানী আল্লাহর হক। অর্থাৎ সন্তান হয়েছে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু কুরবানী দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আকীকার জন্য অনুষ্ঠান করে সেই মাংস রান্না করে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং গরীব-দুঃখীদের খাওয়ানো যেতে পারে। আর অনুষ্ঠান করতে না চাইলে ঐ মাংস আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং গরীব-দুখীদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া যেতে পারে। রসূল (স:) বলেছেন :

ছেলেদের আকীকা কর অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে কুরবানীর মাধ্যমে রক্ত বইতে দাও; এবং কষ্টদায়ক বস্তু (মাথার চুল) মুন্ডন করে দাও। (সহীহ বুখারী)

আকীকা প্রসঙ্গে রসূল (স:) বলেছেন: পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে সমবয়সী দু'টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকীকা দাও। (জামে আত-তিরমিযী)

৯. **ছেলে সন্তানের খতনা করানো:** ছেলে সন্তানকে মুসলমানি করানো সুন্নাহ।

রসূল (স:) হাসান ও হুসাইন উভয়ের আকীকা ও খতনা সপ্তম দিনে করেছিলেন। (বায়হাকী)

অবশ্যই এই কাজটি ভালো ডাক্তার দিয়ে হসপিটাল বা ক্লিনিকে নিয়ে করাতে হবে। উন্নত দেশে ছেলের মুসলমানি জন্মের কিছু দিনের মধ্যে হসপিটালে ডাক্তাররা করিয়ে দেন। উন্নত দেশের অমুসলিমরাও মুসলমানি করায় স্বাস্থ্যগত উপকারিতার জন্য। আমাদের দেশে একটি অনৈসলামী প্রথা প্রচলন আছে যে, মুসলমানির অনুষ্ঠান করা এবং সবাইকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো ও উপহার গ্রহণ করা। এই ধরনের কোন অনুষ্ঠান বা নিয়ম ইসলামে নেই। আমরা না জানার কারণে আকীকা করি না কিন্তু মুসলমানির অনুষ্ঠান করি, অর্থাৎ যেটা করার কথা সেটা করি না কিন্তু যেটা করার কথা না সেটা করি।

কেউ কেউ মনে করতে পারে যে, ছেলেকে মুসলমানি করালে সে ঐ দিন থেকে মুসলিম হয়। এই ধারণা ঠিক না। প্রতিটি শিশু মুসলিম হয়েই জন্মগ্রহণ করে, এমনকি সে হিন্দু বা খৃষ্টানের ঘরে জন্ম নিলেও। পরবর্তীতে তার মা-বাবা ঐ শিশুকে হিন্দু, খৃষ্টান বা নাস্তিক বানায়। (এই কথাগুলি সহীহ হাদীসে আছে।)

শিশু সন্তানকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা

সন্তান জন্ম হলে তার কপালে কালো টিপ দেয়া হয়, পায়ে কালো টিপ দেয়া হয়, এগুলোও কুসংস্কার, এগুলো করা গুনাহর কাজ। অনেকে কথায় কথায় বলে থাকে শিশুরা হচ্ছে ফিরিশতা। এই ধরনের কথাও ঠিক না। শিশুরা হচ্ছে মানুষ, তারা ফিরিশতা হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, তারা নিষ্পাপ। কিন্তু তারা ফিরিশতাদের মতো নিষ্পাপ এই কথা বলাও ঠিক না। ফিরিশতাদের জায়গায় ফিরিশতারা এবং মানুষের জায়গায় মানুষ, এই দু'টি আল্লাহর আলাদা আলাদা সৃষ্টি, কারো সাথে কারো তুলনা করা ঠিক না। মনে রাখা প্রয়োজন যে মানুষের সৃষ্টি মাটি থেকে কিন্তু ফিরিশতাদের সৃষ্টি নূর থেকে। আরো একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। কেউ কেউ সন্তানের গলায় তাবিজ ঝুলিয়ে দেয় সন্তানকে জিন-ভূত থেকে রক্ষা করার জন্য বা কোন বদ নজর থেকে দূরে রাখার জন্য। মনে রাখতে হবে যে কোন ধরনের তাবিজ শরীরে ঝুলানো শিরক এমনকি যদিও সেটি কোন মাওলানা থেকে কুরআনের আয়াত দিয়ে লেখা তাবিজও হয়। শিশুর শরীরে কোন প্রকার কালো সূতা বা কড়ি ঝুলানো যাবে না। এমনকি কুরআনের আয়াতসহ স্বর্ণের বা অন্য কোন ধাতব পর্দাথের লকেট গলায় ঝুলানো যাবে না। এগুলো সুস্পষ্ট গুনাহর কাজ।

সন্তান প্রতিপালনের সাথে আকীদা, ঈমান ও ইহসানের সম্পর্ক

ঈমানের মূল উপাদান ও ভিত্তি গড়ে উঠে আকীদার উপর। ঈমানের মূল বুনিয়াদি হলো আকীদা যা অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ঈমানের ঘোষণা মৌখিকভাবে প্রদান করতে হয় এবং কাজের মাধ্যমে সত্যায়ন করতে হয়। শক্তিশালী ও গ্রহনযোগ্য ঈমানের জন্য বিশুদ্ধ আকীদা ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তি আকীদা সম্পর্কে যত বেশি ইলম অর্জন করবে, তার ঈমান ততই বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নততর হবে।

ঈমান হল আন্তরিক বিশ্বাস যা একজন ব্যক্তির আকীদা হতে উৎসারিত হয়। এই বিশ্বাস একজন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা,আবেগ-অনুভূতি, কথা ও কাজকে প্রভাবিত করে।

ইহসান হলো ঈমানের সর্বোচ্চ পর্যায় যা মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব। এর অর্থ কোনো কিছুকে সর্বোত্তম উপায়ে সম্পাদিত করা। পরিপূর্ণতা এবং উৎকর্ষতা অর্জন করা। ইসলামি শরিয়ত অনুসারে এর অর্থ উত্তমরূপে ইবাদাত ও আমল সম্পাদন করা যেভাবে আল্লাহ তা'আলা করতে আদেশ করেছেন। ইহসানের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে

সর্বোত্তম উপায়ে পরিপূর্ণ করা। ইহসানের নির্যাস হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা- এটি একজন মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে অনুপ্রাণিত করে। মানুষের সাথে উত্তম অখলাক,সুন্দর ব্যবহার করা,তাদের প্রতি সদয় আচরণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

পিতা-মাতার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সন্তানকে মুসলিম হিসেবে বড় করা নয়, বরং তাদের অন্তরে সুদৃঢ় আকীদা ও ঈমানের পরিচর্যা করা। যদি কোনো মুসলিম পরিবার কেবল শিশুদের বাহ্যিক ও ব্যবহারিক দ্বীনি বিষয়াদির প্রতি মনোযোগ প্রদান করে, কিন্তু আকীদার প্রতি উদাসীন থাকে তবে সেই প্রচেষ্টার ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এর দৃষ্টান্ত একটি দুর্বল কাঠামোর উপরে উঁচু ভবন নির্মাণের অনুরূপ। সেই ভবন ধ্বসে পড়বে। কেবল দ্বীনের ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করলে শিশুরা শিখবে কীভাবে সালাত আদায় করতে হয়, সিয়াম পালন করতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলো পালন করার প্রতি তাদের অন্তরে কোনো আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে না। তারা হয়তো নিজের পরিবার, পিতা-মাতা বা মুসলিম বন্ধুদের খুশি করার জন্য সেগুলো পালন করবে, কিন্তু সেই আমল দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

মুসলিম হওয়ার প্রকৃত অর্থ প্রথমে অনুধাবন করা জরুরি। কীভাবে একজন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে এবং কীভাবে ইহসানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে তা অনুধাবন করা জরুরি। শিশুর জন্ম থেকেই তার অন্তরে ঈমানের চাষাবাদ করার কাজ পিতা-মাতাকে শুরু করতে হবে। কীভাবে ইখলাসের সাথে অন্তরে বিশ্বাস এবং বাহ্যিক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করতে হয় তা সন্তানকে অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে। শিশুদের শেখাতে হবে কীভাবে আল্লাহর ভয় অর্জন করতে হয়। কীভাবে ভালোবাসা এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হয়। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা যেন অন্য যে-কোনো ব্যক্তি বা দুনিয়ার যে-কোনো বিষয়ের থেকে অধিক হয়। আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

.... কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় তারা সুদৃঢ়।' (সূরা বাকারাহ, ২: ১৬৫)

একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স:)-এর কাছে এসে জানতে চাইলেন, 'কিয়ামাত কখন হবে? রাসূল (স:) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, সেই দিনের জন্যে তুমি কি প্রস্তুতি-গ্রহণ

করেছ? লোকটি বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালোবাসো, তার সঙ্গেই থাকবে। [২০]

শিশুদের অন্তরে সত্য দ্বীন ইসলামের প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে হবে এবং কুফর ও নিফাকের (দ্বিমুখী আচরণ, মুনাফেকির) প্রতি ঘৃণা তৈরি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ () বলেছেন, 'তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়-

(১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়

(২) যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য কোনো বান্দাকে মুহব্বত করে এবং

(৩) আল্লাহ তাআলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে।খা

তাদের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য-লাভ ও পুরস্কারের আশা থাকতে হবে এবং শাস্তি ও অসন্তুষ্টির ভয় রাখতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে পিতা-মাতা সন্তানকে সত্যিকারের মুমিন হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন, যারা ভবিষ্যতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের বার্তা বহন করবে। একবার ভেবে দেখুন, যদি এই পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে এক শ কোটি মুমিন থাকত তা হলে পৃথিবীর চেহারা কতটা বদলে যেতো এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিন, এই ফর্মুলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'বিল্ডিং ব্লক' হলো আকীদা যা ঈমানের ভিত্তি। ঈমান গড়ে ওঠে আল্লাহর বিষয়ে জ্ঞান এবং একত্ববাদের উপর, তাঁর নাম ও গুণাবলীর উপর, তাঁর শক্তি এবং মহিমা, ক্ষমা এবং রহমতের উপর, তাঁর ইচ্ছা এবং তাকদীবের বিধান ও নবি রাসুলদের প্রতি বিশ্বাসের উপর। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি হতে সঠিক এবং সুদৃঢ় আকীদার গুরুত্বের শেষ নেই, কেননা বিশ্বাস থেকেই কাজের সৃষ্টি হয়। রাসুলুল্লাহ (এ) সাহাবায়ে কেরামদের ইসলামের ব্যবহারিক বিষয় শেখানোর আগে দীর্ঘ তেরো বছর ধরে আকীদা শিখিয়েছেন। ঈমানকে সুদৃঢ় করা এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়া নিশ্চিত করার জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়েছে। যদি পিতা-মাতা সন্তানদের কেবলমাত্র বিশুদ্ধ আকীদার শিক্ষা প্রদান করে এবং বাহ্যিক আমলের কিছুই না শেখায়, তবুও সেই সন্তান জান্নাতে যাওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন হবে তাদের চেয়ে-যারা অনেক সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, দান খয়রাত করে, কিন্তু কবর-মাজার পূজা তথা শিরক করে।

একজন ব্যক্তির মধ্যে সত্য-মিথ্যা পৃথক করার যোগ্যতা (বিবেক) বিকাশের জন্য এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি সঠিক বিশ্বাস থাকা জরুরি। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং সত্য-মিথ্যা পৃথক করার ক্ষমতা কেমন সেই ভিত্তিতেই একজন ব্যক্তি সকল পরিস্থিতিতে বৈধ ও সঠিক কাজটা করতে পারে। সে স্বেচ্ছায় উত্তম বিষয় নির্বাচন করে, জোরপূর্বক তাকে বাধ্য করতে হয় না।

এ কারণে যে-শিশুর মধ্যে ঈমান এবং তাকওয়া বিকশিত হয়েছে তাকে প্রতিপালন করা অনেক সহজ। যে শিশু স্বেচ্ছায় আল্লাহর প্রতি ভয় এবং ভালোবাসার ভিত্তিতে ভালো-মন্দ নির্বাচন করতে পারে তাকে বাইরে থেকে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে হয় না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে কাজের পুরস্কারের দিকে মনোযোগ প্রদান করা হয়, ভালো আচরণের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ আচরণের জন্য শাস্তি প্রদানকে উৎসাহিত করা হয়। এই টেকনিকগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে, কিন্তু এগুলোকে সন্তান প্রতিপালনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। যদি পিতা-মাতা সন্তানের অভ্যন্তরীণ (ঈমানি) শক্তি বিকাশে সহায়তা প্রদান করে, তবে এই ধরনের টেকনিকের খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় মোটেও প্রয়োজন হয় না। ঈমান বিকাশের দিকে প্রধান মনোযোগ দিতে হবে আল্লাহর কাছ থেকে সন্তুষ্টি এবং পুরস্কার অর্জনের দিকে, মানুষের মূল্যায়নের দিকে নয়। শিশুর অন্তরে গভীরভাবে এ বাস্তবতা অনুধাবন করাতে হবে যে মানুষের প্রশংসা, পুরস্কার বা যে-কোনো দুনিয়াবি বস্তুগত কিংবা সামাজিক পুরস্কারের থেকেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার অর্জন অনেক অনেক উত্তম।

পিতা-মাতা সন্তানের অন্তরে ঈমানের পরিচর্যা ও বিকাশ ঘটাবেন যেন তারা সফলতা অর্জন করতে পারে। শুধুমাত্র দুনিয়াতে নয়, বরং আখিরাতের সফলতা হলো প্রধান সফলতা। এ বিষয়টি শিশুদের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে নিতে হবে। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে সফলতা সম্পদ বা ক্ষমতার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় না, বরং সফলতা পরিমাপ করা হয় আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগা এবং আখিরাতের জীবনে জান্নাত অর্জনের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেছেন,

تنعين الذين القوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها لولا قيل عند الله رنا عند الله خير الأبرار.

কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্যে রয়েছে আন্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে ঝর্ণা। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্যে একান্তই উত্তম।' (সূরা আল ইমরান, ৩। ১৯৮)

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات الخرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ابنا رضي الله علهمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم. ُ

'আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে। জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে।আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহা সফলতা।' (সূরা মায়িদাহ, ৫। ১১৯)

নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে বড় অর্জন।

মুসলিম হিসেবে সন্তান প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব অনুধাবন করা খুবই জরুরি। শিশুদের আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো ইত্যাদি বাধ্যবাধকতা বোঝা খুবই জরুরি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَاد. ٌ

'মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারপরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ-হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ।' (সূরা তাহরীম, ৬৬: ৬)

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক:

তাওহীদ ও উবুদিয়্যাহ

সন্তানকে অবশ্যই আল্লাহর পরিচয় দান করতে হবে। আল্লাহর মর্যাদা এবং মহিমার কথা বলতে হবে। আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাকে জানাতে হবে যে, বিচার দিবসে আল্লাহর কাছে প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে। তাকে বলতে হবে যে, আল্লাহ আমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার জন্য আমাদের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁর প্রতি আমাদের দায়িত্বগুলোকে যথাযথভাবে পালন করা। সন্তানদের অন্তরে তাওহীদুল 'উবুদিয়্যাহ' তথা আল্লাহর দাসত্ববোধের চেতনাকে এমন প্রগাঢ়ভাবে প্রোথিত করে দিতে হবে, যেন তার জীবনের প্রতিটি কাজকর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। সন্তানকে আল্লাহর নাম, তাঁর কালাম এবং রাসুলুল্লাহ এদ্র-এর জীবনী শুনিয়ে শুনিয়ে বড় করতে হবে। মুসলিম শিশুদের অবশ্যই তাদের দীনের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী এবং মুসলিম হিসেবে গর্বিত হতে হবে। তাদের অন্তর যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল -এর ভালোবাসায় ভরপুর হয়ে ওঠে। তারা যেন বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের চেতনা নিয়ে উম্মাহর সদস্য হিসেবে বেড়ে ওঠে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কুরআনে এসেছে,

'যদি আমি এ কোরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ এক্স-র ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন; তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যের একক অধিকারী। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষনা করে। তিনি পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আল হাশর; ৫৯:২১-২৪)

নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক

আপনার সন্তানকে রাসূলুল্লাহ-এর পরিচয় দান করুন। যেসব মুসলিম তাদের নিজ নেতাকে চেনে না তারা আসলেই বড় দুর্ভাগা। আপনার সন্তানকে এমনভাবে গড়ে তুলুন যেন

মানবজাতির আদর্শ সেই মহামানব রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে সে অন্যদেরকে জানাতে পারে এবং তাঁর ব্যাপারে তাদের চোখ খুলে দিতে পারে।

ইসলামের মূল ভিত্তি দুটি:

১. কোনো রকম অংশীদার স্থাপন ব্যতীত এক আল্লাহর ইবাদাত করা,

২. সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ -এর নিঃশর্ত আনুগত্য করা।

মুহাম্মাদ রহমত। আল্লাহ হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির প্রতি এক বিশাল বলেন,

'আল্লাহ ঈমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের জন্য আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।' [সূরা আলে-ইমরান; ৩:১৬৪]

ঈমানের পথে আমার যাত্রার একটি বড় মাইলফলক ছিল রাসূলুল্লাহ-এর জীবন সম্পর্কে জানা। এরপর আমার হৃদয়ে তাঁর প্রতি ভালোবাসার বীজ বপিত হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করার ইচ্ছে জাগে।

আল্লাহর অফুরন্ত ভাণ্ডারের

সন্ধান: সালাহ ও দু'আ

আল্লাহর সাথে যখন একটি শিশুর সম্পর্ক দৃঢ় হয়, তখন তার সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য সে কেবল আল্লাহর মুখাপেক্ষী হতে শেখে। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা ও অন্যদের কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে সে বিরত থাকতে শেখে। শিশুরা যখন জানতে পারে যে, আল্লাহর অফুরন্ত ভান্ডারের চাবি হলো সালাহ, তখন সে অবশ্যই যেকোনো বিপদাপদের সময়ে আল্লাহর কাছে সালাতের মাধ্যমেই সাহায্য চাইতে শেখে এবং তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতে থাকবে।

আল্লাহ বলেন,

'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো; অকৃতজ্ঞ হইও না।' [সূরা আল বাকারা; ২:১৫২]

বাচ্চাদের শেখাতে হবে যে, গভীর রাতে কীভাবে সালাতে দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহর রহমতের অশেষ ভান্ডার থেকে চেয়ে নিতে হয়। এর মাধ্যমে বাচ্চারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সুযোগ পাবে এবং আল্লাহও তাদের ডাকে সাড়া দেবেন। কেননা আল্লাহ এ বলেছেন,

'আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, বস্তুতঃ আমি রয়েছি একান্ত কাছেই। যখন প্রার্থনাকারীরা প্রার্থনা করে, তখন তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেই। কাজেই তাদের উচিত আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা; যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।' [সূরা বাকারা: ২:১৮৬]

এভাবে একটি সন্তান 'ইহসান'-এর অর্থ বুঝতে পারে। 'ইহসান' হলো এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যেন তাঁকে আমরা দেখছি; আর তা সম্ভব না হলে অন্তত এতটুকু মনে করতে হবে যে, তিনি আমাদেরকে দেখছেন।আল্লাহকে তখন তার কাছে অনেক বাস্তব বলে মনে হবে এবং রাসূল হবেন তার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব। সে তখন রাসূলের সুন্নাহ অনুসরণ করার গুরুত্ব বুঝবে এবং জানবে যে, এ সুন্নাহই হলো শক্তি ও কল্যাণের উৎস। কেননা, আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হয় রাসূলের সুন্নাহকে অনুসরণ করার মাধ্যমেই। শিশুরা এভাবে আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসতে শিখবে এবং তাঁর উম্মত হিসেবে নিজে গর্ববোধ করবে। সে

নিজেই তখন বুঝতে শিখবে-তার পরিচয় হলো সে একজন মুসলিম, সে মুহাম্মাদ -এর উম্মাত। মানুষের তৈরি করা জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে ওঠে সে ইসলামী সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের স্বাদ আস্বাদন করতে শিখবে। সে নিজেকে আবিষ্কার করবে এক বৃহৎ পরিসরে, এক বিশাল পরিবারের সদস্য রূপে; যার ভিত্তি হলো মুসলিম ভ্রাতৃত্ব। এ ভ্রাতৃত্বের সূচনা করেছিলেন রাসূল (স:) নিজে। স্বয়ং আল্লাহ এ ভ্রাতৃত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এ বোধটাকে ইবাদাত হিসেবে গণ্য করেছেন।

দান ও দা'ওয়াহ: মানবতার প্রতি অবদান রাখা

সর্বশ্রেণীর, বিশেষ করে উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশুদেরকে কাজের মূল্য বোঝাতে হবে। তাদের মধ্যে কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ফ্রিজ ভর্তি খাবার, নরম বিছানা, আর যা চাই তা-ই পাওয়া অনেকের কাছে শুধুই স্বপ্ন। কারণ জীবনে কখনো এগুলো ভোগ করার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। অনেক মানুষ এসব ছাড়াই তাদের সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, সৎ কাজ করা, সৎ সাহস রাখা এবং নিজের কাজ নিজে করার ব্যাপারে সন্তানদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। অন্যদের সাথে নিজের জিনিস ভাগাভাগি করে নেওয়ার আনন্দ তাদের বোঝাতে হবে। কোনো অসহায় একজন মানুষকে কিছু দেওয়ার পর তার চোখে-মুখে ভীষণ আনন্দের যে আভা উদ্ভাসিত হয় তা উপভোগ করা শেখাতে হবে। যে কখনো কিছু পাওয়ার আশা করেনি, তাকে কিছু দেওয়ার আনন্দের সাথে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। নিজের প্রয়োজন নেই এমন কিছু অন্যকে দিয়ে দেওয়াটা ভালো; কিন্তু অন্যের প্রয়োজনে নিজের একান্ত পছন্দের জিনিষটি দিয়ে দেওয়াটা আরও অনেক বেশি প্রশংসনীয়-এ বোধ তাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। কারণ এতে অন্যের প্রতি তার আন্তরিক মমত্ববোধ ফুটে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু-কিশোরদের কাছে 'সময়' খুবই প্রিয় জিনিস। সে যখন বৃদ্ধদের সাথে স্বেচ্ছায় সময় কাটায় তখন তার কিছু সময় তাদেরকে সে দিয়ে দেয়, যদিওবা এর কোনো আর্থিক মূল্য নেই। এ ধরনের কাজে তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে কথা বলে সে কী শিখতে পেরেছে তা নিয়ে আলাপচারিতার মাধ্যমে বাবা-মা সন্তানদেরকে এ কাজে উৎসাহ দিতে পারে। যখন তারা দান করার মাঝে আনন্দ খুঁজে পাবে তখনই কেবল তাদের দান করার মানসিকতা গড়ে ওঠবে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. খিলাফতের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করছেন। একদিন দুপুরে একটুখানি বিশ্রাম নিতে বিছানায় পিঠ রেখেছেন। ইত্যবসরে স্নেহের পুত্র আব্দুল মালিক এসে বলল, "আপনি বিশ্রাম নিচ্ছেন! অথচ মাজলুম ও বঞ্চিতদের প্রাপ্য অধিকার এখনো ফিরিয়ে দিতে পারেননি!"

এ কথা শ্রবণ করে আমীরুল মুমিনীন বললেন, "প্রিয় বৎস, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করতে সারাটা রাত জাগ্রত ছিলাম। তাই এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। যোহরের নামায পড়ে জুলুমের মালগুলো প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ।"

ছেলে প্রত্যুত্তরে বলল, "আব্বু, যোহর পর্যন্ত বেঁচে থাকার কোনো নিশ্চয়তা আছে আপনার?"

এ কথা শুনে ছেলেকে তিনি জড়িয়ে ধরলেন। ললাটে চুমে খেলেন। শুকরিয়া আদায় করে বললেন, "আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমার ঔরস্যে এমন সন্তান দান করেছেন, যে আমাকে দ্বীনের কাজে সহযোগিতা করে।" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া)

সন্তানদের মাঝে সাহসিকতার বীজ বপন করুন

বাচ্চাদের সাহসী বানাতে হলে কয়েকটি কাজ করতে হবে:

- বীরপুরুষদের ঘটনা, বিশেষভাবে সাহাবাদের ঘটনা শোনাতে হবে।
- কথা ও কাজে তাদের সাহসিকতা প্রকাশ পেলে তার প্রশংসা করা।
- কীভাবে ভীতিকর বস্তু জয় করতে হয় এ বিষয়ে তাদের বাস্তবমুখী ট্রেনিং দেওয়া।

আযকারের প্রতি যত্নবান হোন

শিশুহৃদয়ে বিশুদ্ধ আকীদার চারা রোপণের অন্যতম মাধ্যম হলো মাসনূন যিকির-আযকার।

ছোট্ট বয়সেই তাদের দিলে যিকিরের মুহাব্বাত তৈরি করে দিতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া আরম্ভের আগেই মুখস্থ করিয়ে দিতে হবে ছোট-বড় অসংখ্য দুআ-আযকার। মুখস্থ করানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। তন্মধ্যে কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

মাতাপিতা অথবা অন্য যে কারও কণ্ঠে দুআগুলো রেকর্ড করে নিয়মিত শোনানোর ব্যবস্থা করা।

কোনো রঙিন বইয়ে আঁকিয়ে কিংবা বিনোদন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

বিভিন্ন উপলক্ষে বাচ্চাদের সামনে সশব্দে দুআগুলো উচ্চারণ করে।

আব্দুর রহমান রহ. স্বীয় পিতা আবু বাকরা রা.-কে লক্ষ করে বললেন, "আব্বুজি, প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আপনাকে দেখি এই দুআগুলো তিনবার করে পড়েন:

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِيَ اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

'হে আল্লাহ, আপনি আমার শরীর সুস্থ রাখুন। হে আল্লাহ, আপনি আমার শ্রবণশক্তি সুস্থ রাখুন। হে আল্লাহ, আমার দৃষ্টিশক্তি সুস্থ রাখুন। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।'

আবু বাকরাহ রা. বললেন, 'আমি এই দুআগুলো রসূল-কে সকাল-সন্ধ্যায় পড়তে শুনেছি।" (আল-আদাবুল মুফরাদ)

অতএব অভিভাবকের দায়িত্ব হলো সন্তানকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিভিন্ন দুআ-দুরূদ পড়া-যাতে তারা শুনে শুনে মুখস্থ করতে পারে এবং নিজের আমলী জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে। (আল-আদাবুল মুফরাদ)

আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া

শিশু যখন একটু একটু বুঝতে শিখে তখন তাকে মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তা তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে। তিনি আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন তা সুন্দর করে উপস্থাপন করতে হবে। তাদেরকে বুঝতে দিতে হবে যে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হতে পারেন এমন কোন কাজ করা যাবে না। এমনকি যদি লুকিয়েও কিছু করা হয় তাও আল্লাহ দেখবেন এবং পরে শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহর কথা শুনলে তিনি খুশী হবেন এবং যা চাওয়া হবে তাই তিনি দিবেন।

কুরআনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া

আমাদের দেশে মুসলিমদের মাঝে কুরআনের প্রতি এক প্রকার ভীতি দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে। একে ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না, মখমলের কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখতে হবে, শেলফের সবচেয়ে উঁচু তাকে রাখতে হবে, মাঝেমধ্যে তাকে চুমু খেতে হবে ইত্যাদি। এগুলো সবই ভুল আচরণ এবং কুরআন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ইবলিস শয়তানের কারসাজি (প্ররোচনা)। শিশুদেরকে কায়দা, আমপারা পড়ার পাশাপাশি কুরআনের আরবী কপিও হাতে দিতে হবে যেন তাদের এর প্রতি কোন ভয়-ভীতি না থাকে।

শিশুর সাথে খেলাধুলা করা

খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক এবং শারীরিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে। তাই তাদের খেলার সুযোগ করে দিতেই হবে। মা-বাবার উচিত শিশুদের সাথে খেলাধুলা করা, সামর্থ অনুযায়ী তাদেরকে খেলাধুলার সামগ্রী কিনে দেয়া উচিত। আজকাল বাজারে অনেক প্রকার খেলনা পাওয়া যায় যা শিশুর মানসিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অধিকাংশ মা-বাবাদের প্রশ্ন এই যে, কোন বয়সের বাচ্চার জন্য কোন ধরনের খেলনা দেবো? এছাড়াও অনেক মা-বাবা আছেন যে, বাচ্চা পছন্দ করলেই খেলনা কিনে দেন। কিন্তু হতে পারে ঐ খেলনার গায়ে উপযোগি বয়স লিখাই আছে। তারা সেটা মানতে চান না। তাতে একটু পরে বাচ্চাও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং পয়সাও নষ্ট হয়। ওদিকে চকিং হ্যাজার্ড (choking hazard) তো আছেই। তাই মা-বাবাদের উচিত বাচ্চার বয়স অনুযায়ী খেলনা কিনে দেয়া। আরও একটি বিষয় হচ্ছে

শিশুদেরকে শুধু কোলে কোলে না রেখে তাদেরকে ধুলা-বালি-মাটি-কাদার সাথে মিশতে দেয়া। প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে তাদেরকে খেলতে দেয়া উচিত।

শিশুদের সাথে কথা বলা

শিশুদের সাথে কথা বলার সময় পিতা-মাতার উপস্থিত থাকা উচিত:

- শিশুরা সাধারণত যে বয়সে বেশী কথা বলে। যেমন: ঘুমানোর আগে শুয়ে শুয়ে, ডাইনিং টেবিলে খাওয়ার আগে, গাড়িতে কোথাও যাবার সময়।

- তাদেরকে এটা বুঝতে দিতে হবে যে, সে যে বিষয়ের গুরুত্ব দিচ্ছে তা তার মা-বাবাও গুরুত্ব দিচ্ছে।

- শিশুরা যে কাজগুলো করে তার সাথে সপ্তাহে অন্ততপক্ষে একদিন মা-বাবার উচিত সময় দেয়া এবং সেই কাজগুলো করা।

- শিশুদের কাছে যে বিষয়গুলো বেশী আগ্রহ সেই বিষয়গুলোর উপর মা-বাবার উচিত দক্ষতা অর্জন করা।

শিশুদের বুঝতে দিতে হবে যে পিতা-মাতা তাদের কথা গুরুত্বসহকারে শুনছে:

- শিশুরা যখন কোন একটি বিষয়ে কথা বলা শুরু করে তখন মা-বাবার উচিত তাদের নিজের কাজ বন্ধ করে দিয়ে শিশুর কথা শুনা।

- তাকে বিরক্ত না করে বা তাকে কথার মাঝখানে বন্ধ করে না দিয়ে তার কথার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

- যদি তার কথা ঠিক মতো বুঝাও না যায় তবুও তার কথা মনোযোগ সহকারে শুনা উচিত।

- তাদের কথা পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত মা-বাবা কোন কথা বলা ঠিক নয়।

- তার কোন কথা বুঝা না গেলে তাকে আবার জিজ্ঞেস করা উচিত।

এমনভাবে শিশুদের সাথে আচরণ করতে হবে যেন তারা কথা শুনে:

- তাদের সাথে শক্ত কথাও নরম করে বলতে হবে, তাদের সাথে রাগান্বিত কণ্ঠে অথবা প্রতিরোধের কণ্ঠে কথা বলা যাবে না।

- তাদেরকে ছোট করে বা হেয় করে কোন কথা বলা যাবে না। স্বীকার করতে হবে যে তাদের দ্বিমত প্রকাশ করার অধিকার আছে।

- তাদের সাথে দ্বিমত নিয়ে তর্ক করা ঠিক নয়। বরং এভাবে বলা যেতে পারে যে, "আমি জানি তুমি আমার সাথে একমত নও কিন্তু আমি এটা মনে করি"।

- শিশুর সাথে কথা বলার সময় শ্রোতার নিজের অনুভূতির কথা বাদ দিয়ে শিশুদের অনুভূতির দিকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

সন্তানদের প্রতি করণীয়

সন্তান-সন্ততি আল্লাহর পক্ষ হতে আমানত। এ আমানতের খিয়ানত করা যাবে না। সকল খিয়ানতকারীর বিরুদ্ধে ইসলামে কঠোর হুঁশিয়ারী রয়েছে।

খুব ছোট অবস্থা হতে সন্তানদের প্রতি কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হতে হবে। তাদের জাগতিক উন্নতির পাশাপাশি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যেও যাই দায়িত্বশীল। কেবল ভাল স্কুলে ভর্তির স্বপ্ন দেখবো আর ভাল রেজাল্ট করার জন্য এ আমানত আমাকে দেয়া হয়নি। আমার উপর আমার সন্তানের অধিকারের মধ্যে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়টিও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি সন্তানের ভুল শিক্ষার জন্য মা-বাবার দায়-দায়িত্ব এড়ানোর কোন উপায় নেই।

একজন বাবা বা মা তার সন্তানকে যে মূল্যবোধে বড় করেন সন্তান সেভাবেই গড়ে উঠে। সন্তানের মানসিকতা, পছন্দ, অপছন্দ, ত্যাগের শিক্ষা, অন্যদের প্রতি মমত্ববোধ, সততা, আল্লাহকে চেনা, পরকালের ধারণা ইত্যাদি সকল ব্যাপারে মা-বাবার করণীয় অবশ্যম্ভাবী। এ থেকে তাদের মুক্তি নেই। সম্পূর্ণ অসহায় একটি শিশুকে এর স্রষ্টা এমন দু'জন মানব-মানবীর নিকট আমানত হিসেবে পাঠান যারা সামর্থবান, যাদের সহায়-সম্বল দেয়া হয়েছে, যাদের বিবেক-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে, যাদের ভালমন্দের জ্ঞান আছে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তার সকল দায়-দায়িত্ব মা-বাবার উপর বর্তায়। এবার চিন্তা করি আমার এ শিশুকে কী শিক্ষা দেয়া উচিত? কোন ভাবাদর্শে আমি তাকে গড়ে তুলবো? এ শিশুর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হবে? তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি হবে? কোন মৌলিক উপাদান দিয়ে তার চিন্তা-চেতনাকে গড়ে তুলবো?

আমি যেখানেই থাকি না কেন ইসলামী মূল্যবোধ আজকাল সর্বত্রই অনুপস্থিত। সকলে কেবল একটি মূল্যবোধে উজ্জীবিত, সেটি হলো কৃত্রিম Status-এর মূল্যবোধ। ঢাকা শহর বলি আর গ্রাম-গঞ্জ বলি মৌলিক বোধ আজ সবখানেই এক এবং একাকার হয়ে গেছে। সুতরাং আমি কোথায় আছি তাতে তেমন কোন কিছু যায় আসে না।

সর্বপ্রথম জেনে নেয়া উচিত যে, আমার সন্তান একটি স্বতন্ত্র সত্তা। বড় হয়ে সে তার নিজের হিসাব নিজে দেবে। মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিন আমাদের পারস্পরিক বন্ধন কোন ইতিবাচক কাজে আসবে না বরং নেতিবাচক কাজে আসার সম্ভাবনা বেশী। অর্থাৎ যে সন্তানকে আল্লাহর হুকুম বিরোধী কাজকর্মে নিয়োজিত করেছি সে সন্তানই আমার বিরুদ্ধে কথা বলবে। আখিরাতের আদালতে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাবো, দিশা হারিয়ে ফেলবো যখন দেখবো আমাদেরই প্রিয় সন্তান আমাদের অন্যায় কাজগুলি প্রমাণসহ দেখিয়ে দিয়ে আল্লাহর নিকট বিহিতের ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তাঁর কুরআনে জানাচ্ছেনঃ

"সর্বশেষে যখন সে কান-বধিরকারী ধ্বনি উচ্চারিত হবে (অর্থাৎ কিয়ামত হাজির হবে), সে দিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মা ও বাবা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে পালাবে। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সেদিন এমন সময় এসে পড়বে যে, নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি লক্ষ্য করার মত অবস্থা থাকবে না।" (সূরা আবাসাঃ ৩৩-৩৭)

উত্তম উপদেশ প্রদান

সন্তানের জীবদ্দশায় সৎচরিত্র গঠন, আদর্শ শিক্ষা অর্জন, দ্বীনী হুকুম-আহকাম ভিত্তিক অভ্যাস গঠনের লক্ষ্যে উত্তম নসীহত প্রাপ্তি সন্তানের অধিকার। আসলে এমন অধিকার জগতের প্রত্যেক মা-বাবাই আদায় করতে চেষ্টা করেন।

অনেক সময় সন্তানরা মা-বাবার আদেশ নিষেধ ভুলে গেলে বা পালন করতে দেরী করলে মা-বাবারা রাগ করেন, নতুন করে জানতে চাইলে বলেন- এখন আর বলতে পারব না। এত বলতে হবে কেন? এখন বয়স হয়েছে না, বড় হয়েছে না, নিজে বুঝে না অথবা বকা দিয়ে বলে বেয়াদব, বদমায়েশ, অসভ্য, যা এখান থেকে বেরিয়ে যা, আমার চোখের সামনে থেকে যা, আর আসবি না, তুই মর, জান্নামে যা ইত্যাদি। এখানে এ কথাগুলো পবিত্র কুরআন এর একটি দৃষ্টান্ত থেকে উলেখ করা যাক:

কুরআনে আল্লাহ সলাত কায়েম করার কথা ৮০ বারেরও বেশী বলেছেন। একবার দু'বার নয়। যদি আল্লাহ একবার দু'বার বলে রাগ করতেন, আর না বলতেন বা আমাদের মত বকাবকি করতেন তাহলে না হয় ভাবতাম আমাদের নীতি ঠিক আছে; কিন্তু আল্লাহ তো বলেছেন অনেক বার। তবু রাগ করেননি। তারপরও যখন আমরা ঠিকমত সলাত আদায় করি না তবুও তো তিনি বকা দেন না. এ দুনিয়া থেকে বের হয়ে যেতে তো বলেন না, আলো-বাতাস থেকে আমাদেরকে এক সেকেন্ডের জন্যও বঞ্চিত করেন না।

উত্তম ব্যবহার শিক্ষা দান

রসূল এগু বলেছেন: কোন বাবা তার সন্তানদের উত্তম আচার-ব্যবহারের চেয়ে অধিক ভাল কোন জিনিস উপহার দিতে পারে না। (তিরমিযী)

সন্তানদেরকে উত্তম আচার-ব্যবহার শিক্ষাদান একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

যেমন: অনেক ছেলেমেয়েরাই ফোন রিসিভ করে সালাম দেয় না। মা-বাবার বন্ধুদের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলে না। মা-বাবা বা বড় ভাই-বোনের সাথে ঝগড়া বা তর্ক করে, রুঢ় ভাবে কথা বলে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা যেন মনে না করি যে তারা আদব-কায়দা ক্লাসের বই

পড়ে শিখবে বা স্কুল টিচাররা শেখাবেন। মনে রাখা উচিত এখনকার অধিকাংশ স্কুলগুলোতে শিক্ষার এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে যেখানে আদব কায়দা শেখানো হয়। বরং আজকাল টিভি দেখে সন্তানরা এমন আচরণ শিখছে যা আমাদের ইসলামিক কালচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই আমার সন্তানকে আদব-কায়দা আমাকেই সুন্দরভাবে শিক্ষা দিতে হবে। বাস্তবে দেখা গেছে যে অনেক পরিবার ইসলামিক মাইন্ডের কিন্তু সন্তানেরা আদব-কায়দা জানে না কারণ তাদের সেটা শেখানো হয়নি। আমাদের প্রিয় নাবী ﷺ বলেছেন: কারো সাথে হাসি মুখে কথা বলাও একটা সদাকা।

একটি সুন্দর প্ল্যান করে বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সাথে শিশুদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। খানা-পিনা, উঠা-বসা, ঘুম ও জাগরণের আদব শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি আদব, মসজিদ-স্কুলের আদবের কথা তাদের বলতে হবে। পাক-পবিত্রতার আদব, স্বাস্থ্য ও পবিত্রতার আদব, চলাফেরা এবং সাথী-সঙ্গীদের সাথে উঠা-বসার আদব, গৃহের এবং নিজের জিনিসসমূহকে সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে ব্যবহারের নিয়ম শিক্ষা দিতে হবে এবং একটি সভ্য ও পবিত্র জীবন পরিচালনার জন্য অব্যাহতভাবে আমাকে তার অভিভাবকত্ব করতে হবে। একবার শুধু কোনো ভালো জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আর্কষণই যথেষ্ট নয় বরং প্রশিক্ষণের দাবী হলো যে, আমি সে ব্যাপারে অব্যাহতভাবে দৃষ্টি রাখবো এবং বারবার ভুল সত্ত্বেও বিরক্ত হবো না। ধৈর্য ও সবরের সাথে এবং অন্তর দিয়ে তাদেরকে শুধরে দিতে থাকবো এবং সামান্যতম ভুলকেও তুচ্ছ মনে করবো না।

দুষ্টামী আর বেয়াদবী এক নয়

শিশুরা দুষ্টামী করবে এটিই স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক। তারা দৌড়াদৌড়ি করবে, ছুটাছুটি করবে, খেলবে, লাফাবে, বল ছুড়ে মারবে, হৈচৈ করবে, দেয়ালে দাগাবে, ফ্লোর নষ্ট করবে, পানি দিয়ে খেলবে, রং দিয়ে খেলবে, কিচেনের হাড়ি-পতিল এনে খেলবে, মা-বাবার জামা-কাপড় পরে খেলবে, মা-বাবা সলাতে সিজদায় গেলে তাদের ঘাড়ের উপরে উঠবে ইত্যাদি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কোন কোন শিশু এই বিষয়গুলোতে বেশী একটিভ, আবার কোন কোন শিশু কম একটিভ। শিশুদের এই কাজগুলোতে বাধা দেয়া ঠিক না, এতে তার প্রতিভা প্রকাশে ব্যাঘাত ঘটে। যে সকল শিশু এই কাজগুলোতে বেশী একটিভ তাকে ভুল বুঝে বেয়াদব মনে করা যাবে না, তাকে চড়-থাপ্পড় দেয়া যাবে না। কারণ বেয়াদবী আর দুষ্টামী এক জিনিস নয়।

সন্তানদেরকে ঘরের কাজকর্মে অভ্যস্ত করা

আমরা আমাদের সন্তানদেরকে খুবই ভালবাসি। এই ভালবাসার নমুনাস্বরূপ তাদেরকে অনেক সময় অকর্মণ্য করে ফেলি। অনেক পরিবারে ছোটবেলা হতে সন্তানদেরকে নিজ হাতে এক গ্লাস পানি ঢেলেও খেতে অভ্যস্ত করেন না। মেয়ে হাই-স্কুলে বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে কিন্তু একটি ডিমও ভেজে খেতে পারে না। সন্তানদের সব ধরনের কাজ করার অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। যেন বলতে না হয়, "আমার বাচ্চারা তো কিছু পারে না।" এটা ঠিক না, তাদেরকে চেষ্টা করতে দিতে হবে, প্রথমে ভুল করবে, কিছু জিনিস নষ্ট করবে, খুব বেশী সুন্দর হয়ত হবে না- তারপর একসময় ঠিকই পারবে ইনশাআল্লাহ। আসুন এ বিষয়ে সতর্ক হই, সন্তানদেরকে ছোট হতে ঘরের কাজে ট্রেইনআপ করি। শিক্ষণীয় হিসেবে দু'টি বাস্তব উদাহরণ দেয়া যাক।

চিত্র এক ঃ ২০০৭ সালে আমরা সপরিবারে লন্ডন গিয়েছিলাম ইষ্ট লন্ডন ইসলামিক সেন্টার পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। ইষ্ট লন্ডন ইসলামিক সেন্টারের প্রেসিডেন্টের বাসায় আমাদের দুপুরে লাঞ্চের দাওয়াত ছিল। যা হোক আমরা প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসায় যে দৃশ্য দেখলাম তা হলো, প্রেসিডেন্ট সাহেবের হাই স্কুল পড়ুয়া ছেলেটা রান্না ঘরে হাড়ি-পাতিল-প্লেট-গ্লাস ধুচ্ছে, ঘর ঝাড় দিচ্ছে এবং বাথরুম পরিষ্কার করছে।

চিত্র দুই : NICAS Canada-র এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টরের বড় ছেলে টরন্টো ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। আমাদের ক্যানাডিয়ান লাইফে এতো ভদ্র ছেলে আমরা কখনও দেখিনি। কী তার অমায়িক ব্যবহার! এছাড়াও সে অসুস্থ বাবার মাথার পানি ঢালা থেকে শুরু করে মার সাথে ঘরের অন্যান্য কাজকর্মও করে থাকে।

ভারসাম্যপূর্ণ অভ্যাস তৈরী করা

মা-বাবারা সন্তানদের প্রায় সকল সহনীয় দাবী দাওয়া মেনে নিতে চান। এতে আপাতঃ দৃষ্টিতে কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। তবে কিছু কিছু বিষয়ে সতর্ক ব্যবস্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সহজ করে তুলবে। আমার সন্তান যদি চা পানে অভ্যস্ত হয় তাতে কোন দোষ নেই, কিন্তু চা পান না করলে তার স্কুলের হোমওয়ার্ক হবে না বা কফি না খেলে তার পড়া হয় না- এ জাতীয় অভ্যাসকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলা নিরাপদ। ঠিক

তদ্রূপ মাংস ছাড়া আর কিছু তার পছন্দ নয়, বা একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের কাপড় ছাড়া সে অন্য কিছু ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়, ইত্যাদি কোন কিছুতে যেন তার দিগন্ত সীমিত হয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এতে আমাদের সন্তান ফ্লেক্সিবল হয়ে গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

যদি সন্তানের ব্যক্তিত্বকে এভাবে গড়ে তোলা যায় তা হলে সে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই নিজেকে সামলিয়ে চলতে পারবে। অনেক ছেলেমেয়েদেরকে দেখা যায় মাছ খায় না কাঁটার ভয়ে, শাক খান না কারণ ছোটবেলা হতে শাক খাওয়ায় অনভ্যস্ত। এধরনের অভ্যাস যেন না হয় সেদিকে বাবা-মায়েদের খেয়াল রাখা প্রয়োজন। সন্তানদেকে তার নিজের ফর্ম নিজে ফিলাপ করতে দেয়া উচিত। আমার যে কটি গাড়ীই থাক না কেন সন্তানদের মাঝে মধ্যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে চলতে ফিরতে অভ্যস্ত করা উচিত। যাতে প্রয়োজনে তারা বিনাদ্বিধায় যেখানে সেখানে যাতায়াত করতে পারে। তবে যদি সন্তানের নিরাপত্তা হারাবার আশঙ্কা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। এ উদাহরণগুলো দেয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো আমার সন্তান যেন বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে না উঠে।

আমরা মা-বাবারা বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব জিনিসই দেই। কিন্তু একটা বাচ্চা কিছু চাইলে তার সাথে আলাপ করা দরকার সে এটা কেন চায়,
এটা দিয়ে সে কি করবে, এর উপকারীতা ও অপকারীতাগুলো কি কি? জিনিসটি আদৌ তার প্রয়োজন আছে কি'না এবং এই টাকায় সে আর কি করতে পারে? এতে করে ওরা স্বার্থপর হবার পরিবর্তে needs এবং wants এর মধ্যে তফাত করতে শিখবে, অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দিতে শিখবে।

সবচেয়ে বড় যুলুম

আমরা আমাদের সন্তানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুলুম যেটা করছি তা হচ্ছে আমরা ভুলে গেছি যে আমাদের সন্তানদের দু'টি জিনিস (১) দেহ ও (২) আত্মা নিয়েই তাদের গোটা অস্তিত্ব। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাদের দেহের প্রতি এতো বেশী যত্ন নেয়া হয়েছে যে আত্মার দিকে নজরই দেয়া হয়নি। যার কারণে দেহের অত্যধিক যত্ন নিয়ে আধ্যাত্মিকতার চরম অবজ্ঞা করে মন ও আত্মাকে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে।

সন্তানকে অভিশাপ না দেয়া

মা তার সন্তানকে অবর্ণনীয় কষ্টে গর্ভেধারণ করেন। অমানুষিক কষ্টে পৃথিবীর আলো-বাতাসে আনেন। তারপর নিজের ভালবাসা আর ত্যাগের সবটুকু উজাড় করে অসহায় একটি শিশুকে যথাক্রমে সুস্থ, সবল, সজ্ঞান ও স্বাবলম্বী করে তোলেন। সন্তান মানুষ করতে গিয়ে মা-বাবাকে যে কতটুকু কষ্ট সহ্য করতে হয় তা শুধু মা-বাবারাই জানেন। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে এ কষ্ট আরও বেশি। এখানে রোজ দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে লড়াই করে মানুষকে টিকে থাকতে হয়।

অভাবের কারণে একজন নবীন মাকেও একহাতে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব আর অপরহাতে বুকের ধন সন্তানটিকে আগলে রাখতে হয়। অনেক মা আছেন যারা সময়মত বাচ্চার খাবারটিও যোগাতে পারেন না রুচিমত। বিশেষত যেসব বাচ্চা জন্মের পর মায়ের বুকের দুধ পায় না। দরিদ্র পরিবারে এসব শিশুকে যে কত কষ্টে মা জননী বড় করে তোলেন তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। এ সময় মায়েদের অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়।

অথচ অনেক মা'কে এ সময় ধৈর্যহারাও হতে দেখা যায়। অনেক মা সন্তানের উপর বিরক্ত হয়ে তাকে অবলীলায় অভিশাপ দিয়ে বসেন। স্নেহময়ী জননী হয়তো তার জীবনের বিনিময়ে হলেও সন্তানের যে কোনো অনিষ্ট রোধ করতে চাইবেন। কিন্তু তিনিই আবার রাগের মাথায় অবচেতনে আদরের সন্তানটির অনিষ্ট কামনা করে বসেন। প্রায়ই দেখা যায় সন্তানদের দুষ্টুমিতে অতিষ্ট হয়ে কোন কোন মা সরাসরি সন্তানের নানা রকম অনিষ্ট কামনা করে বসেন। যেমন:

তুই মরিস না কেন? তুই মরলে ফকিরকে একবেলা ভরপেট খাওয়াতাম।

আল্লাহ, আমি আর পারিনা, এর জ্বালা থেকে আমাকে নিস্তার দাও!

তুই ধ্বংস হ!

তুই জাহান্নামে যা!

তুই যদি এরকম আবার করিস তাহলে আমার মড়া মুখ দেখবি।

এ জাতীয় বাক্য আমরা অহরহই শুনতে পাই। গর্ভধারিণী মা কখনোই তার সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না। কিন্তু অসচেতনভাবে কামনা করা দুর্ঘটনাও কখনো সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই এ সময় মাকে অনেক বেশি ত্যাগ ও ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হয়। ইসলাম কখনো কারো বিরুদ্ধে অভিশাপ দেয়া বা বদদু'আ করাকে সমর্থন করে না। আপন সন্তানকে তো দূরের কথা জীবজন্তু এমনকি জড় পদার্থকে অভিশাপ দেয়াও সমর্থন করে না। জাবির ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

বাতনে বুওয়াত যুদ্ধের সফরে রসূলুল্লাহ ১৫-এর সঙ্গে পথ চলছিলাম। তিনি মাজদী ইবন 'আমর জুহানীকে খুঁজছিলেন। পানি বহনকারী উটগুলোর পেছনে আমাদের মধ্য থেকে পাঁচজন, ছয়জন ও সাতজন করে পথ চলছিল। উকবা নামক এক আনসারী ব্যক্তি তাঁর উটের পাশ দিয়ে চক্কর দিল এবং তাকে থামাল। তারপর তার পিঠে উঠে আবার তাকে চলতে নির্দেশ দিল। উটটি তখন একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। তিনি তখন বললেন ধুত্তুরি। তোর উপর আল্লাহর অভিশাপ। এ শুনে রসূলুল্লাহ এ বললেন, নিজের উটকে অভিশাপদাতা এই ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, আমি হে আল্লাহর রসূল। তিনি (রসূলুল্লাহ এ৫) বললেন, 'তুমি এর পিঠ থেকে নামো। তুমি আমাদের কোনো অভিশপ্তের সঙ্গী করো না। তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, তোমাদের সন্তান-সন্ততির এবং তোমাদের সম্পদের বিরুদ্ধে দু'আ করো না। তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন মুহূর্তের জ্ঞানপ্রাপ্ত নও, যখন যা কিছুই চাওয়া হয় তিনি তোমাদের তা দিয়ে দেবেন।' (সহীহ মুসলিম)

হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, অর্থাৎ তোমরা কোনো মুহূর্তেই নিজের বিরুদ্ধে, নিজের সন্তান বা সম্পদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করো না। কারণ, হতে পারে যে সময় তুমি দু'আ করছো, তা দিনের মধ্যে ওই সময় যখন যা-ই দু'আ করা হোক না কেন তা কবুল করা হয়। তোমরা তো এ সময় সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত নও। (মুবারকপুরী, মিরআতুল মাফাতীহ)

'হাদীসটি রাগের মাথায় মানুষের তার পরিবার ও সম্পদের বিরুদ্ধে দু'আ করার নিষিদ্ধতা প্রমাণ করে। হাদীসটিতে এর কারণও তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো, দু'আ কবুলের কিছু বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে এবং তা ঠিক ঐ মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। ফলে সেই মুহূর্তে মানুষের সবই কবুল হয়ে যায় চাই তা ভালো হোক বা মন্দ হোক, যা সে তার পরিবার বা সম্পদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করে না।' (আবদুল মুহসিন, শারহু সুনান আবী দাউদ)

নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে দু'আ করার অর্থ তো নিজেই নিজেকে হত্যার তথা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'আর তোমরা নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।'

(সূরা বাকারা ২: ১৯৫)

অতএব প্রতিটি মাকে ভেবে দেখতে হবে, আমার রাগের মাথায় উচ্চারণ করা বাক্য যদি সত্যে পরিণত হয় তাহলে কেমন লাগবে? আমি কি তা সহ্য করতে পারব? এ জন্য রাগের মাথায়ও কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করা যাবে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে শুধু মায়েদেরই নয়, আমাদের সবারই উচিত নিজের, নিজের সন্তান ও সম্পদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করা থেকে সংযত হওয়া। রাগের সময় সংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়া।

আমাদের সন্তানের বিবাহ

সন্তানের উপযুক্ত বয়স হলে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাল দ্বীনদার ছেলে বা মেয়ে দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। ছেলেমেয়েদের স্টুডেন্ট লাইফেও বিয়ের কথা চিন্তা করা যেতে পারে, তবে তা দেশের আইন অনুযায়ী হতে হবে। যদি স্টুডেন্ট লাইফে বিয়ে দিতেই হয়ে তাহলে এ ব্যাপারে মা-বাবাদের কয়েকটি বিষয়ে যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হবে যেমনঃ

১) বিয়ের পর তাদের সংসার চলবে কিভাবে?

২) তাদের পড়াশোনা চলবে কিভাবে?

৩) সন্তান-সন্ততি হলে তা দেখাশোনা করতে পারবে কিনা ইত্যাদি।

যদি এই সকল বিষয়ে মা-বাবা তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন তাহলে স্টুডেন্ট লাইফে বিয়ের ব্যাপারে অনেক সুবিধা। পাত্র বা পাত্রীর শুধু ক্যারিয়ার বা একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন বা শুধু টাকা-পয়সা বা বংশ-গৌরব দেখা ঠিক নয়। সর্বপ্রথম দেখতে হবে

পাত্র বা পাত্রী দ্বীনদার কিনা, যদি পাত্র বা পাত্রী দ্বীনদার না হয় তাহলে ছেলে বা মেয়েকে এই আধুনিককালে জীবন চালাতে খুব হিমসিম খেতে হবে। তাই রসূল বলেছেন:

মেয়েদেরকে সাধারণতঃ চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ দেখে, বংশ মর্যাদা দেখে, রূপ-সৌন্দর্য দেখে এবং তার দ্বীনদারী দেখে। তবে তোমরা দ্বীনদার মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর, তোমাদের কল্যাণ হবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

দ্বীনের জ্ঞান থাকা আর দ্বীন পালন করাই হচ্ছে পাত্র বা পাত্রীর সবচেয়ে বড় কোয়ালিফিকেশন। আর এই ধরনের কোয়ালিফাইড পাত্র-পাত্রী জীবনে সুখী হতে বাধ্য, ইনশাআল্লাহ। একই বিষয় ছেলে অর্থাৎ পাত্র দেখার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পাত্রের শুধু নাম-জশ, টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, ভাল চাকুরী বা ব্যবসা দেখলে চলবে না। পাত্র দ্বীনদার কিনা সেদিকেই বেশী জোর দিতে হবে, পাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে কিনা, পাত্রের ইসলামের উপর সহীহ জ্ঞান আছে কিনা এবং সেই অনুযায়ী সে জীবন পরিচালনা করে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে জানতে হবে।

কন্যা সন্তানের প্রতি দায়িত্ব

সন্তান ছেলে বা মেয়ে যাই হোক সন্তান সন্তানই। সে হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। এতে কোন মানুষের হাত নেই। তবু যারা কন্যা হলে মন খারাপ করেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করেন, স্ত্রীকে বকাবকি করেন তারা একটু লক্ষ্য করি, যাদের সন্তান নেই, যাদের মা-বাবা হওয়ার মত ভাগ্য আল্লাহ তা'আলা দেননি অথবা দিয়েছিলেন আবার নিয়েও গেছেন সেই সকল মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি। তারা সন্তান-সন্তান বলে কী না করছে! যদি আপনজনদের মধ্যে এমন কেউ থাকেন তাহলে বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছাতেই আমাদেরকে একের পর দুই, দুয়ের পর তিন এভাবে কয়েকজন কন্যা সন্তান দান করেছেন। এতে কন্যার বাবাদের মন খারাপ হলেও আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ১৫ কিন্তু ঘোষণা করে দিয়েছেন, "কারো তিনজন কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করলে, যথাসাধ্য তাদের পানাহার করালে ও পোশাক-আশাক দিলে, তারা কিয়ামাতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে।" (ইবনে মাজাহ)

ভাল পাত্রের নিকট মেয়েকে বিয়ে দেয়া

সন্তানদের একটা বয়স পর্যন্ত সব রকমের অধিকার আদায়ের পরও কন্যাদের প্রতি আরো কয়েকটি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়; এগুলোর অন্যমত হলো মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিয়ে দেয়া। নাবী মুহাম্মাদ বলেনঃ "যার দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট সে যদি তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে তার সাথে বিয়ে দাও। যদি তা না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।" (আত-তিরমিযী)

আমাদের দেখা এমন অনেক ঘটনা আছে যে, ছেলে খুবই ভাল এবং এডুকেটেড কিন্তু দ্বীন ইসলামের জ্ঞান নেই এবং প্র্যাকটিস নেই, তাই বেশীরভাগ সংসার টিকেনি, যেগুলো টিকে আছে সেই সংসারে রয়েছে শুধু অশান্তি। একইভাবে মেয়ে খুবই ভাল কিন্তু দ্বীনদার না অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের জ্ঞান নেই এবং দ্বীন ইসলাম ঠিক মতো পালনও করে না। সেই সংসারও টিকেনি, আর যেগুলো দেখে মনে হচ্ছে টিকে আছে সেখানেও প্রকৃত শান্তি নেই। এই পাত্র-পাত্রীরা নিজেরাও জানে না কেন এই অশান্তি, এর মূলে কিসের অভাব। অতএব সব বাবা-মার দায়িত্ব সন্তানকে ঈমানদার মুসলিম পাত্র বা পাত্রীর সাথে বিবাহ দেয়া যাতে সন্তানের জন্য একটা সফল সুন্দর সংসার জীবন আশা করা যেতে পারে।

সন্তানদের সালামের অভ্যাস করানো

আমাদের সন্তানদের সর্বত্র সালামের ব্যবহার শেখাতে হবে। সবাইকে সালাম দেয়ার অভ্যাস করতে হবে, হতে পারে সে ছোট বা বড়। বাসায় ঢুকেই বাসার সকলকে সালাম দিতে হবে। খালি বাসায় ঢুকেও সালাম দিতে হবে, কারণ ঘরে রহমতের ফিরিশতা থাকে। ফোন আসলে প্রথমে ফোন ধরেই আগে সালাম দিতে হবে। কোথাও ফোন করলে সর্বপ্রথমে সালাম দিয়ে শুরু করতে হবে। সালামকে বিকৃত করা যাবে না অর্থাৎ "স্লামুয়ালাইকুম" বলা যাবে না, কারণ এই বিকৃত সালামের কোন অর্থ হয় না। সন্তানদেরকে বলতে হবে সম্পূর্ণ সালাম পরিষ্কারভাবে দিতে "আস্সালামু আলাইকুম"।

সন্তান হয়তো কখনো কখনো সালাম দিতে ভুলে যেতে পারে। এটা প্র্যাকটিসের বিষয়, কোন কোন পরিবারে সালামের প্রচলন ব্যপকভাবে নেই বলে সন্তানরাও ঐভাবে গড়ে উঠে না। সন্তানকে কখনই বলার দরকার নেই 'আংকেলকে সালাম দাও, দাও দাও সালাম দাও।' 'দাদাকে সালাম দাও, আন্টিকে সালাম দাও ইত্যাদি বলার দরকার নেই। বরং বড়রা যদি

প্রতিদিনের জীবনে ছোট-বড় সবাইকে সালাম দেয় তাহলেই ঐ বাসার প্রতিটি শিশু সন্তানরা সালাম দেয়া ও সালামের জবাব দেয়া শিখবে।আমরা আরো একটি ভুল সবসময় করি, আসলে এটা আমাদের দেশের কালচার। বড়রা সবসময় ছোটদের থেকে সালাম আশা করেন। এটা মোটেও ঠিক না। আমাদের দেশে অধিকাংশ মা-বাবারা নিজ সন্তানদের সালাম দেন না। সালাম একটি উৎকৃষ্ট দু'আ এর অর্থ 'তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক'। কিন্তু এই দু'আ মা-বাবারা সন্তানদের জন্য করতে লজ্জাবোধ করেন। শুধু সন্তানদের থেকে নিজেদের জন্য এই দু'আ আশা করেন কিন্তু সন্তানের শান্তির জন্য দু'আ করেন না।

আমাদের সমাজে শুধু মা-বাবারা নন। অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র-ছাত্রীদের সালাম দেন না, ইমাম সাহেব রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সাধারণ লোকদের সালাম দেন না, অফিসে বস কর্মচারীদের সালাম দেন না, সাহেব গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে সালাম দেন না। কেউ রিক্সায় বা সিএনজিতে উঠে কখনোই কোন রিক্সাওয়ালা বা সিএনজিওয়ালকে সালাম দেন না।

আমরা আসলে সালামের প্রকৃত অর্থ বুঝি না বলে একে অপরের জন্য দু'আ করি না। যেমন বস যখন গাড়িতে উঠে বসেন তখন সালাম কার জন্য বেশী প্রয়োজন? বসের না ড্রাইভারের? আসলে বসের চেয়ে সালামের বেশী প্রয়োজন ড্রাইভারের। কারণ ড্রাইভার যখন গাড়ি চালাবে তখন তার বেশী শান্তিতে থাকা প্রয়োজন যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। ঠিক একইভাবে সন্তান যখন স্কুলে যায় তখন শান্তি বেশী প্রয়োজন মায়ের চেয়ে সন্তানের কারণ সে স্কুলে যাওয়ার পথে নানা রকম দুর্ঘটনায় পরতে পারে, তাই বাসা থেকে বিদায় নেয়ার কালে মায়ের উচিত সন্তানকে সালাম দেয়া।

সুন্দর কথার সুফল ও অসুন্দর কথার কুফল শিক্ষাদান

সুন্দর কথা: সুন্দর বা সকলের পছন্দনীয়, সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য কথা বলার ধরণ আমাদের জানা প্রয়োজন। কেননা সুখী পরিবার গঠনে সুন্দর কথা বিশেষ তাৎপর্যবহ। অবশ্য সুন্দর করে কথা বলা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কাজেই এ বিষয়ে আমাদের অভ্যাস গঠন করা অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং শিখি:

১) বাঁকা চোখে তাকিয়ে, ভ্রু কুঞ্চিত করে, বাঁকা-বাঁকা, পেচানো, কথায় কথায় খোঁচা না মেরে সোজা করে কথা বলতে চেষ্টা করা।

২) ভাষার ও কথার জটিলতা বা কৃত্রিমতা পরিহার করে সহজ, সকলের বোধগম্য করে কথা বলা।

৩) সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করে কথা বলতে চেষ্টা করা, অসুন্দর, অসামাজিক, অশ্রাব্য মন্দ ভাষাগুলোকে কথোপকথনে ব্যবহার না করা।

৪) যেকোন কথা প্রকাশ্যে মুখ কালো করে না বলে স্বাভাবিকভাবে বা হেসে হেসে বলা উত্তম। রসূল এন্ড বলেছেন, "তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা একটি দান।"

৫) কোমল ভাষায় কথা বলা উত্তম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: "এটা আল্লাহরই দয়া যে, তুমি তোমার সাথীদের প্রতি কোমল। তা না হয়ে তুমি যদি কঠোর হতে তা হলে, তারা তোমার চারদিক থেকে দূরে সরে যেতো।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

৬) সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দ ব্যবহার করা।

৭) স্পষ্ট ও উপস্থিত শ্রোতার বা যার উদ্দেশ্যে কথা তার বোধগম্য করে বলা।

৮) আঞ্চলিকতা, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রতা পরিহার করে বইয়ের ভাষায় বিশুদ্ধ কথা বলা।

৯) শ্রোতার বা উপস্থিত সভ্যদের কল্যাণকামী, হিতকর কথা বলা।

১০) বাসায়, সামাজিক পরিমন্ডলে এবং অফিস কর্মস্থলে একইভাবে সবসময় কথা বলার চেষ্টা করা।

১১) সদালাপী ও মিষ্টভাষী হওয়া।

১২) অর্থবহ কথা বলা, অর্থহীন বাজে কথা না বলা।

১৩) তর্ক-বিতর্ক না করা, তর্কে কোন সমাধান হয় না।

১৪) শুধু যুক্তি দেখিয়ে কথা না বলা, সব বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা যায় না। অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জ্ঞানগর্ভ কথা বলা-- যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে।

১৫) একজনের পেছনে বা অনুপস্থিতিতে আরেকজনের কাছে তার প্রসঙ্গে মন্দ কথা না বলা। এটি গীবতের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি অবধারিত।

১৬) কথা বলার ক্ষেত্রে এমন মনে করা আল্লাহর দেয়া জবানকে আল্লাহর নির্দেশমত ব্যবহার করছি। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

১৭) কটু কর্কশ, রুক্ষ, আঘাত বা হিট করামূলক, অপমানসূচক কথা না বলা।

১৮) অপ্রাসঙ্গিক, বেশি কথা, অনর্গল কথা না বলা।

১৯) শ্রোতাকে কখনো উপহাস, বিদ্রুপ, ঠাট্টা ও তিরস্কার করে কথা না বলা।

২০) মিথ্যা কথা না বলা কারণ মিথ্যা সকল পাপ কাজের জননী।

২১) কারোর নামে অপবাদ না দেয়া, কারণ এমন অপবাদ একসময় নিজের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে তা মনে রাখা।

২২) শপথ না করা কারণ সময়ের ব্যবধানে বিপদ কেটে গেলে বা সুসময়ে সে শপথের কথা অনেকেরই মনে থাকে না। যদিও এটি মানার ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কঠোর।

২৩) কথায় কথায় চেঁচামেচি করা, জোরে কথা বলা, মেজাজ গরম করে কথা না বলা।

২৪) অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে না বেড়ানো।

২৫) মেয়েরা মেয়েদের মত, মহিলারা মহিলাদের মত, ছেলেরা ছেলেদের মত, পুরুষেরা পুরুষের মত কথা বলা।

২৬) স্থান-কাল-পাত্রভেদে কথা বলা।

২৭) ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা: অশ্লীল কথা, গালি দিয়ে কথা না বলা।

২৮) কখনো কখনো আনন্দদায়ক, বৈধ রসিকতা করে কথা বলা।

২৯) কারো সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে নেতিবাচক বিশ্লেষণ গাধা, গর্দভ, বোকা, পাগল-ছাগল, গরু, বলদ ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে কথা না বলা।

৩০) ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয়া, প্রশংসা করা। শুধু বিরোধিতার কারণে বিরোধিতা না করা।

৩১) যে উপকার করেছে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উত্তম। প্রিয় নাবী এ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হয় না।" (আবু দাউদ)

৩২) সুন্দর ভাষায় সহজ করে উপদেশ বা পরামর্শ দেয়া, নিজের ব্যাপারে শ্রোতার কোন কথা, কোন পরামর্শ আছে কিনা জানতে চাওয়া এবং পরামর্শ-দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো।

৩৩) ভাষা আল্লাহর মহিমা: সুতরাং সব সময় তার পবিত্রতা রক্ষা করা।

৩৪) শ্রোতার জন্যে দু'আ করা, নিজের শুভ কামনার কথা তাকে বলা।

৩৫) ভুল করে ফেললে বা ভুল হয়ে গেলে আমি দুঃখিত কথাটি বিনয়ের সাহস বলার চেষ্টা করা।

সর্বোপরি এমন কথা না বলা যাতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কষ্ট পায় এ নীতিতে প্রতিদিন প্রত্যেক বিষয়ে সচেতনতার সাথে স্রষ্টা ও মানুষের পছন্দনীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মেজাজে কথা বলার চেষ্টা এবং বাস্তবায়ন করা সচ্চরিত্রের উত্তম বহিঃপ্রকাশ। যা সকল মানুষ একে অপরের কাছে প্রত্যাশা করে এবং পাওয়ার অধিকারও রাখে।

অসুন্দর কথা: অসুন্দর কথা মানে সর্বত্র অশান্তির বিষ বাষ্প ছড়িয়ে দেয়া। অসুন্দর কথার ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এতে অস্থির হয়ে উঠতে পারে পারিবারিক জীবন, নষ্ট হতে পারে দুনিয়ার শান্তি। কিন্তু কিভাবে?

১) অসুন্দর কথায় মানুষ অসন্তুষ্ট হয়।

২) পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

৩) সম্পর্কে ফাটল ধরে।

৪) প্রতিবেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, বিপদে এগিয়ে আসতে চায় না।

৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

৬) একে অপরের সাথে অন্তরঙ্গতা নষ্ট হয়। বন্ধুত্ব বিনষ্ট হয়।

৭) পরিবারের ভাঙ্গন শুরু হয়, সন্তান অমানুষ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৮) রাগারাগি, মারামারি ও হানাহানির সৃষ্টি হয়।

৯) মান-ইজ্জত, সম্মান, পজিশান বিনষ্ট হয়।

১০) সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়।

১১) ঐক্য ও একতা বিনষ্ট হয়।

১২) পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহবোধ বিলীন হয়ে যায়।

১৩) এমন ব্যক্তির মৃত্যু হলে প্রতিবেশীরা লাশ দাফন করতে যেতে চায় না।

১৪) রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দানা বেঁধে উঠে।

১৫) সর্বোপরি দুনিয়ায় অশান্তি এবং আখিরাতে জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া অবধারিত হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং এমন অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পেতে আমাদের উচিত সুন্দর করে কথা বলা, সদালাপী হওয়া।

সন্তানদের সকাল-সন্ধ্যার দু'আ শিক্ষা দেয়া

আমাদের প্রিয় নাবী এগু দৈনিন্দিন জীবনে কিছু দু'আ পাঠ করতেন। যদি কুরআন ও হাদীসের আমলকারী আল্লাহর কোন বান্দা সে সমস্ত দু'আ পাঠ করেন তাহলে তিনিও আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ লাভে ধন্য হতে পারবেন। আমাদের সন্তানদের জন্য এই সকল দু'আ আরবী, অর্থ এবং উচ্চারণসহ আমাদের ছোটদের জন্য প্রকাশিত দু'আর বইতে পাওয়া যাবে। এই দু'আগুলো মুখস্থ করানোর বিষয়েও মা-বাবাকে সিরিয়াস হতে হবে এবং প্রতিদিন অন্ততপক্ষে দু'টি বা একটি দু'আ অর্থসহ সন্তানদের মুখস্থ করাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে আমার সন্তান প্রতিদিন এই দু'আগুলো তার বাস্তব জীবনে ব্যবহার করছে কিনা। যেমন, খাওয়ার সময় বা টয়লেটে ঢুকার সময় যদি যে দু'আ না পড়ে তাহলে তাকে মনে করিয়ে দিতে হবে। এভাবে প্রথম প্রথম তারে কিছু দিন দু'আগুলো আমল করার বিষয়ে তাগাদা দিতে হবে এবং এক সময় সে এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। যেমন:

ঘুমানোর সময় দু'আ

ঘুম থেকে উঠে দু'আ

খাওয়া শুরুর ও শেষে দু'আ

পায়খানার দু'আ

ওযু করার পর দু'আ

সলাতের মধ্যে দু'আ

পাঁচ ওয়াক্ত সলাত শেষে দু'আ

বিপদ-আপদের দু'আ

আযানের দু'আ

বাড়ী থেকে বের হওয়ার দু'আ

বাড়ীতে প্রবেশের দু'আ

যানবাহনে চড়ার দু'আ

মা-বাবার জন্য সন্তানের দু'আ

স্মরণশক্তি বৃদ্ধির দু'আ

মুখের জড়তা দূর করার দু'আ

সকাল-সন্ধ্যার দু'আ।

সন্তানদের পড়ালেখায় ভাল করার বিষয়ে বাবা-মায়ের সহায়তা

সন্তানের জন্য দু'আ করা : সন্তানের জন্য সব সময় দু'আ করতে হবে। অনেক বাবা-মায়েরাই সন্তানের জন্য নিয়মিত দু'আ করেন না। সন্তান যেন সব বিষয়েই ভাল করে সেজন্য প্রতি ওয়াক্তের সলাতের শেষে দু'আ করা উচিত।

ভাল স্কুল/কলেজ নির্বাচন : এই বিষয়টি আমাদের দেশে বলার অপেক্ষা রাখে না। সকল বাবা-মায়েরাই চান তার সন্তান একটি ভাল স্কুলে বা কলেজে পড়বে। তবে যে সকল স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ সেকুলার বা ইসলাম বিদ্বেষী সেই সকল প্রতিষ্ঠান যতো ভালই হোক না কেন সেগুলোতে সন্তানদেরকে ভর্তি না করালেই ভাল। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরে।

পড়ালেখায় মনোযোগ নষ্ট করতে পারে তা থেকে সতর্কতা : ঘরে যদি এমন কিছু থাকে যার কারণে সন্তানদের পড়ালেখায় ক্ষতি হতে পারে তা সরিয়ে নেয়া উচিত। অনেক সময় টেলিভিশন সন্তানদের পড়ালেখার প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। বাসার বড়রা কেউ হয়তো ড্রইংরুমে বসে টিভিতে নাটক দেখছে তখন ছেলেমেয়েদের পড়ায় মন বসে না, তাদেরও নাটক দেখতে ইচ্ছে করে, তদের মন পড়ে থাকে টিভির মধ্যে।

পারিবারিক রুটিন থাকা উচিত: আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সাধারণত
প্রতিদিন সন্ধ্যার পর পড়তে বসে। কিন্তু সেই সময় যদি প্রায়ই বাসায় মেহমান আসে বা বাবা-মায়ের বন্ধু-বান্ধব আসে তাহলেও ছেলেমেয়েদের পড়ালেখায় ক্ষতি হয়। পারিবারিক রুটিন এমন হওয়া উচিত যেন তারা পড়তে বসে বাধার সম্মুখিন না হয়। পরিচিতরাও যেন পারিবারিক রুটিন সম্পের্কে অবগত থাকে।

ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে দেয়া: আমি যেনো আমার সন্তানদের ভালভাল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেই, পরিচয় করিয়ে দেই, পরিবারিকভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে দেই। এতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাল করার উৎসাহ বাড়বে।

অর্থ খরচ করার মানসিকতা: আর্থিক সমস্যা না থাকার পরও কোন কোন বাবা-মা সন্তানদের প্রয়োজনীয় খাতা, বই, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি স্টেশনারী কিনে দিতে চান না। গাফিলতি করে সন্তানদের স্কুল-কলেজের বেতন দেরী করে দেন, প্রাইভেট শিক্ষক বা কোচিংয়ের বেতন ঠিক মতো দিতে চান না। এই ধরনের মনমানসিকতাও পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

স্পেশাল কেয়ার (তত্ত্বাবধান): যে সন্তানটি কম মেধা সম্পন্ন বা একটু দেরীতে বুঝে বা একটু কম বুঝে, তাদের পিছনে অতিরিক্ত সময় দেয়া উচিত। তাকে অবহেলা করা ঠিক না বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা একেবারেই ঠিক না। তাকে প্রচুর পরিমানে উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের প্রকাশিত ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের ৮ নং বইটি সংগ্রহ করে পড়ার অনুরোধ রইল।

স্বাস্থ্যগত সমস্যায় করণীয়: কোন কোন ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যগতভাবে দুর্বল,
প্রায়ই অসুস্থ থাকে। তাদের দিকেও স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে। তার স্বাস্থ্যগত দুর্বলতার কারণে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। তাকে ডাক্তার দেখিয়ে পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে হবে।

স্টাডি টুরের ব্যবস্থা করা: অনেক স্কুল-কলেজে স্টাডি টুরের ব্যবস্থা থাকে। সন্তানদের স্টাডি টুরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া যেতে পারে। স্টাডি টুরের মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটে। তবে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে স্টাডি টুরে গিয়ে ছেলেমেয়েরা অবাধ মেলামেশায় সুযোগ না পায়।

স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা: ছাত্র-ছাত্রীরা স্কলারশিপ পেলে পড়ালেখায় আরো উৎসাহ পায়। তাই তাদের স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য উৎসাহ দেয়া উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কলারশিপ ছাড়াও আরো অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ দিয়ে থাকে, খোঁজ-খবর নিয়ে সেগুলোর ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে।

অতিরিক্ত বোঝা না চাপানো: বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে পড়ালেখার পাশাপাশি পরিবারের আরো অনেক কাজ করতে হয়। যেমন ঘরের কাজ, বাজার করা, বিল দেয়া, বাবার ব্যবসা দেখা ইত্যাদি। এই কাজগুলো করা ভাল তবে খেয়াল রাখতে হবে যে এই কাজগুলোর যেন একটা সীমা থাকে। তাদের ঘারে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না এতে পড়ালেখার ক্ষতি হতে পারে।

পরীক্ষায় খারাপ করলে করণীয়: সন্তান পরীক্ষায় খারাপ করলে তার জন্য চেচামেচি করে বাসা মাথায় করা যাবে না। তার সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। তার সাথে সময় নিয়ে বসতে হবে, বুঝতে হবে কেন সে পরীক্ষায় খারাপ করেছে, তার প্রকৃত কারণগুলো খুঁজে বের করে তার সমাধানের দিকে যেতে হবে। তাকে আরো উৎসাহ দিয়ে তার পেছনে বাবা-মাকে আরো অতিরিক্ত সময় দিয়ে তার দুর্বলতাগুলো দূর করতে হবে।

পরিমিত ঘুম প্রয়োজন: অনেক ছেলেমেয়েরাই রাতে দেরীতে ঘুমোতে যায়, এটি মোটেও ঠিক না। সেদিকে বাবা-মাকে খেয়াল রাখতে হবে। ছেলেমেয়েরা যেন বেশী রাত না করে। ঘুম পরিমিত না হলে সকালে উঠতে কষ্ট হয়, ফজর সলাত মিস হতে পারে এছাড়া সারা দিন ক্লাসেও মন বসবে না।

সন্তানের পড়ার স্থান কেমন হবে: পড়ার স্থানে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো-বাতাস থাকে, জানালা থাকলে খুবই ভাল। পড়ার জন্য রিডিং টেবিল এবং হাইট অনুযায়ী চেয়ারও প্রয়োজন। এতে তার পড়ালেখায় মনোযোগ আসবে। অনেক মা-বাবা আছেন বৈদ্যুতিক বিল কমাবার

জন্য বাসায় সব সময় স্বল্প আলোর ব্যবস্থা করে থাকেন। পরামর্শ থাকবে যে, যদি সামর্থ থাকে অন্তত সন্তানদের পড়ালেখার সময় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা।

দারিদ্রতা দূর করা: দারিদ্রতার কারণে অনেক ছেলেমেয়েরা ঠিক মতো পড়ালেখায় মন বসাতে পারে না। সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা করে দারিদ্রতামুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। দারিদ্রতা থেকে মুক্তির জন্য সবসময় মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করতে হবে।

পারিবারিক দাওয়াত: পারিবারিক দাওয়াত প্রায় সকল পরিবারেই রয়েছে,
বিশেষ করে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে। অতিরিক্ত পারিবারিক দাওয়াত ছেলেমেয়েদের পড়ালেখায় ক্ষতি করে। তাই বলে কোনো দাওয়াতেই না যাওয়া উচিতও নয়। এমনিতেই আজকালকার সন্তানরা অনেকটা অসামাজিক হয়ে যাচ্ছে অনলাইন যোগাযোগে অভ্যস্ত হবার কারণে। এই দাওয়াত খাওয়া এবং দাওয়াত দেয়া দুটোই কন্ট্রোল করা উচিত। যখন তখন ছেলেমেয়েদেরকে বাসায় রেখে দাওয়াতে চলে যাওয়া ঠিক না আবার তাদেরকে হঠাৎ করে পড়া বাদ দিয়ে সাথে নিয়ে যাওয়াও ঠিক না। দাওয়াতের বিষয়ে সন্তানদের প্রতিদিনের ক্লাসের হোমওয়ার্ক এবং পরের দিনের ক্লাস ও সামনের পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে প্ল্যান করতে হবে।

সন্তানদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খারাপ ব্যবহার না করা: কোন কোন বাবা-মা সন্তানদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। এই কাজটি মোটেও ঠিক না। এটি সন্তানের মনে আঘাত হানে। সন্তানের কোন বন্ধু যদি ভাল না হয় তাহলে তার সাথে খারাপ আচরণ না করে নিজ সন্তানকে তার বন্ধুর খারাপ দিকগুলো বুঝাতে হবে এবং সে যেন আস্তে আস্তে এই বন্ধু থেকে সরে আসে।

সন্তানদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করা

মেধা বিকাশে সাহায্য করা: ছেলেমেয়েদের মেধা বিকাশে সর্বপ্রথমে বাবা-মাকে এগিয়ে আসতে হবে। অতঃপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। অনেক ছেলেমেয়েদেরই ভাল মেধা আছে কিন্তু সঠিক সহযোগীতা এবং গাইডেন্সের অভাবে তারা তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ পায় না।

ক্যারিয়ার পছন্দে সহায়তা করা: অনেক ছেলেমেয়েরা নিজেরাই নিজেদের। ক্যারিয়ার কী হবে তা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। অবশ্যই তারা তাদের ভবিষ্যতের ক্যরিয়ারের সিদ্ধান্ত নিবে কিন্তু বাবা-মাকেও এই বিষয়ে সাহায্য করতে হবে। ছেলেমেয়েদের ক্যারিয়ার নিয়ে যেন একমুখি চিন্তা না হয় যে তারা শুধু অনেক বড় হবে অনেক টাকা কামাবে বা অনেক নামকরা একজন হবে ইত্যাদি।

সময়কে কাজে লাগানো: সন্তানদের ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অনেক আগে থেকেই শুরু করা উচিত, যাতে তারা সময়কে সঠিক কাজে লাগাতে হবে। ভাল ক্যারিয়ারের জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে সফলতা অর্জনের বাস্তবভিত্তিক গাইডলাইন হিসেবে আমাদের প্রকাশিত "ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে কীভাবে উন্নতি করবে" এই বইটি সহায়তা করবে। এই বইটি সংগ্রহ করে ছেলেমেয়েদেরকে দেয়ার অনুরোধ রইলো।

উৎসাহ প্রদান ও মোটিভেশন: উৎসাহ মানুষকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ছেলেমেয়েদেরকে সব সময় ভাল কাজের উৎসাহ প্রদান করতে হবে, কোন একটি বিষয়ে খারাপ করলেও তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করে তাকে উৎসাহ দিলে সে পরবর্তীতে অনেক ভাল করে। মোটিভেশন হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট থিউরী। কোন একটি অর্গানাইজেশনের উদ্বর্তন কর্মকর্তাগণ তাদের কর্মচারী-দেরকে দিয়ে আরো ভাল প্রডাকশন পাওয়ার জন্য সব সময় মোটিভেশন দিয়ে খাবেন। ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে মোটিভেশন একটি সফল ঔষধ। মোটিভেশন হতে পারে কথা দিয়ে, পুরস্কৃত করে, কিছু আয়োজন করে।

সঠিক কোর্স পছন্দ করার বিষয়ে সাহায্য করা: ইউনিভার্সিটি লেভেলে ছেলেমেয়েদের সঠিক কোর্স নির্ধারণে বাবা-মাকে এগিয়ে আসা উচিত। সঠিক কোর্স বাছাইয়ে ভুলের কারণে অনেক ছেলেমেয়েরাই জীবনে ভাল করতে পারে না। তাই এই বিষয়টিতে খুবই গুরুত্ব দেয়া উচিত।

সফল ব্যক্তিদের সাথে দেখা করা: যে সকল ব্যক্তিরা জীবনে সফলতা অর্জন করেছেন তাদের সাথে ছেলেমেয়েদেরকে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেয়া যেতে পারে। এতে ছেলেমেয়েরা তাদের জীবনেও অনেক উৎসাহ পাবে।

রাজনীতি থেকে দূরে রাখা: ছেলেমেয়েদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে তারা যেন কোন রাজনীতির সাথে জড়িয়ে না যায়। হ্যাঁ তারা রাজনীতি বুঝবে, এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে, কোন দলকে সাপোর্ট করবে, কিন্তু মাঠে ময়দানে যেন কোন

রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ডে সংযুক্ত না হয়। যখন তারা পড়ালেখা শেষ করে প্রফেশনাল লাইফে যাবে তখন চাইলে দেশ গড়ার জন্য সুস্থ রাজনীতি করতে পারে।

সন্তানের সলাতের ট্রেনিং

আমি কি জানি ১০ বছর বয়স থেকে আমার সন্তানের উপর সলাত ফরয? রসূল এ বলেছেন: "সাত বছর বয়স হলে তোমাদের সন্তানদের সলাত আদায়ের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়স হওয়ার পর এজন্য তাদের প্রতি কঠোর হও এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" (আবু দাউদ)

অনেক মা-বাবারাই সন্তানের পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়ের বিষয়ে গুরুত্ব দেন না। কোন কোন মা-বাবা হয়তো সন্তানদের মাঝে মাঝে তাগাদা দেন যে 'এই নামায পড়ো' কিন্তু এই পর্যন্তই শেষ, সে পড়লো কি পড়লো না সেই বিষয়ে তারা খুব একটা সিরিয়াস না। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কেউ যদি এক ওয়াক্ত সলাত ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় বা না পড়ে তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তাকে তাওবা করে আবার ইসলামে ঢুকতে হয়। একটি বাচ্চার বয়স যখন ১০ বছর হয় (বা বালেগ হয়) তখন থেকে তার উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ফরয। সন্তান যদি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় না করে এবং এক ওয়াক্তও ছেড়ে দেয় তাহলে সে জন্য সন্তানের পাশাপাশি মা-বাবাকেও আখিরাতের ময়দানে অপরাধী হিসেবে ধরা হবে।

আমরা হয়তো সন্তানের কষ্ট হবে বলে তাকে ফজরে সলাতের জন্য উঠাই না, বা বারে বারে ওযু করে সলাত আদায় করবে তার কষ্ট হবে মনে করে তাগাদা দেই না। কিন্তু আখিরাতের ময়দানে এই আদরের সন্তান মা-বাবাকে আল্লাহর সামনে দোষারূপ করবে। বলবে হে আল্লাহ, এরাই আমাকে সলাত আদায় করা শেখায় নাই, এরাই আমাকে সলাতের অভ্যাস করায় নাই, এরাই আমাকে সলাতের জন্য তাগাদা দেয় নাই, এদের জন্যই আমি বেনামাযী হয়েছি।

কোন কোন মা-বাবা মনে করেন, এখন বয়স কম, এখন এই বিষয়ে বেশী সিরিয়াস হওয়ার কিছু নেই, বড় হলে পড়বে। এই ধরনের ধারণা একেবারেই ভুল। পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ফরয, সে যেখানেই থাকুক না কেন। আমার সন্তান স্কুলে বা কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে যোহর ও আসরের ওয়াক্তে সলাত আদায় করে কিনা সে ব্যপারেও খেয়াল রাখতে হবে এবং

তারা যেন সময় মতো যোহর ও আসর সলাত আদায় করে সে জন্য তাদেরকে সুন্দর করে বোঝাতে হবে, মোটিভেশন দিতে হবে এবং প্রয়োজনে কঠোরও হতে হবে। কোনভাবেই এই বিষয়ে ছাড় দেয়া যাবে না। এই বিষয়ে সন্তানদের ছাড় দেয়া মানে তাদের জীবনে মারাত্মক ক্ষতি করা, তাদের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনা, তাদের আখিরাত নষ্ট করা।

আমরা স্বামী-স্ত্রী যদি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়ে নিয়মিত না হই তাহলে আজ থেকে আমাদের দু'জনকেই নিয়মিত হতে হবে। যদি মা-বাবাকে সন্তান পাঁচ ওয়াক্ত সলাত নিয়মিত আদায় করতে না দেখে তাহলে তারাও কখনো সলাত আদায়ে উৎসাহী হবে না। স্বামী/স্ত্রী পরামর্শ করবে কিভাবে সন্তানদের সলাতের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী করা যায়। প্রথমে তাদের নরমভাবে বুঝাতে হবে। তাদের সাথে মোলায়েম ও ভাবগম্ভীরভাবে কথা বলতে হবে। সলাতের ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। কাজ না হলে মৃদু ধমক দেয়া যেতে পারে।

শুদ্ধভাবে সলাত শিক্ষা দেয়া: সলাতের সম্পর্কে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

খেয়াল রাখতে হবে আর তা হচ্ছে সন্তানদের সহীহ শুদ্ধভাবে সলাত শেখানো। বাজারে সলাতের প্রচুর বই পাওয়া যায় যা নামায শিক্ষা নামে প্রচলিত কিন্তু তাদের বেশীরভাগই সহীহ নয় অর্থাৎ আল্লাহর রসূল এঙ যেভাবে সলাত আদায় করেছেন তার উপর ভিত্তি করে নয় অর্থাৎ সহীহ হাদীস ভিত্তিক নয়। সন্তানদের শুরু থেকেই সহীহ দলিল অনুযায়ী সলাতের শিক্ষা দিলে পরবর্তীতে আর কোন সমস্যা হবে না।

ফরয ইবাদতের গুরুত্ব

আল্লাহর ফরয ইবাদতের বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে আরো ভালোভাবে অনুধাবন করা যাক। আমরা সবাই আমাদের সন্তানদের খুব ভালোবাসি, নিজের জীবনের চেয়ে অধিক ভালোবাসি। যেমন আমার সন্তানের একদিন খুব জ্বর হলো এবং ডাক্তার ঔষধ দিয়েছে জ্বর সারানোর জন্য। কিন্তু সে ঔষধ খেতে চাচ্ছে না তিতা বলে। তিতা ঔষুধ খেতে তার কষ্ট হয়। এখন আমি যদি তার প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে তার কষ্টের কথা মনে করে তাকে ঔষধ খেতে না দেই তাহলে কী হবে? আবার যেমন জ্বর খুব বেশী হওয়ার কারণে শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। এখন তার তাপমাত্রা কমানোর জন্য ঠান্ডা পানি দিয়ে তার শরীর মুছে দেয়া প্রয়োজন কিন্তু আমার সন্তান এই কাজটিও পছন্দ করছে না, কারণ

শরীর মুছার সময়ও তার কষ্ট হয়। এবার আমি যদি তার কষ্টের কথা চিন্তা করে তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে তার শরীর মুছে না দেই তাহলে কী হবে? ঔষধ না খাওয়ার কারণে এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে হয়তো তার জীবনে বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এমনকি মারাও যেতে পারে।

ঠিক উপরের উদাহরণের মতো সন্তানের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে ভোরে উঠতে কষ্ট হবে বলে যদি তাকে ফজরের সলাতে না ডাকি, রমাদান মাসে কষ্ট হবে বলে যদি তাকে সিয়াম পালনে গুরুত্ব না দেই, পর্দা করার বিষয়ে গুরুত্ব না দেই তাহলে আদরের সন্তানদের নিয়ে আখিরাতে একই ঘটনা ঘটবে।

ইসলামী বিনোদনের বিষয়ে সতর্কতা

ইসলামী বিনোদনের নামে বাজারে অনেক নাটক, সিনেমা, ম্যাগাজিন, কার্টুন ইত্যাদি পাওয়া যায় যেগুলো আসলে ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে অনৈসলামী। যারা এগুলো তৈরী করেন তাদের হয়তো সহীহ আক্বীদার উপর সঠিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এই প্রকার অনেক বিনোদনেই হালাল এবং হারামকে মিশ্রণ করে ফেলেছেন। ইসলামের নামে অনেক গান রয়েছে যেমন: হাম্দ, নাথ, মারফতী, কাউয়ালী ইত্যাদিতে রয়েছে অনেক শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত কথা।

সন্তানদের প্রতি আজেবাজে মন্তব্য না করা

অনেক মা-বাবা সন্তানদের প্রতি নানা রকম কমেন্ট বা মন্তব্য করেন। এতে ছেলেমেয়েদের মন ছোট হয়ে যায়, তারা নিজেরা অপমানিতবোধ করে, মনে খুবই কষ্ট পায়। তাদের অপরাগতার জন্য তাদেরকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতে হবে। নিম্নে কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হলো। এই জাতীয় আজেবাজে বাক্য বা মন্তব্য করা ঠিক না। যেমন:

ছেলেটা একটা গাঁধা!

মেয়েটা আস্ত একটা গর্ধব!

তুমি একটা গরু।

তোমার মাথা ভরা গোবর!

তুমি একটা ফালতু মেয়ে!

তুমি একটা অসভ্য ছেলে!

ছেলেটা একটা শয়তানের হাড্ডি!

তোমার চেয়ে ওমুকে অনেক ভাল!

সর্বশেষ কথা:

আমাদের সন্তানদের প্রতি যে সচেতনতা কাজ করে তা আমাদের দ্বীনেরই ভিত্তি। আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে যে চিন্তা এটা আমরা পেয়েছি আমাদের বাবা ইব্রাহিম (আ:)-এর কাছ থেকে। আসলে তারও আগে আমরা প্রথম যেই সচেতন বাবার কথা জানতে পেরেছি তিনি ছিলেন নূহ (আ:)। নূহ (আ:) তার সন্তানের ব্যাপারে খুব বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে তার সন্তানকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তো আমাদের সন্তানের দ্বীনি বিষয়ে আমাদের সচেতনতা এই ধর্মের বহু পুরোনো ভিত্তি। আল্লাহ আমাদের একটা বিষয় শেখাতে চেয়েছেন যে, আমাদের নাবীদের সন্তানেরাও সমস্যাগ্রস্ত ছিল। ইব্রাহীম (আ:)-কে আল্লাহ অত্যন্ত নেককার দু'জন সন্তান দিয়েছিলেন, তাকে দিয়েছিলেন ইসমাঈল এবং ইসহাক (আ:)। তিনি দু'জন অপূর্ব সন্তান পেয়েছিলেন। কিন্তু নূহ (আ:) তেমন পাননি। ইয়াকুব (আ:)পেয়েছিলেন কয়েকজন অনুগত সন্তান আবার কয়েকজন সমস্যাগ্রস্ত সন্তান। তবে তার সন্তানদের বেশীরভাগই অবাধ্য ছিলেন।

তার মানে আমাদের নাবীদের মধ্যেই এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা সন্তানের ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। আর এ কথাটা মাথায় রাখা জরুরি কারণ যদি নাবীদের তাদের সন্তানের ব্যাপারে সমস্যায় পড়তে হয়, তাহলে আমি.... আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন.... আমরা সন্তানের ব্যাপারে আমাদের সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে পারব না! এটা আল্লাহর হৃদরেরই অংশ।

আল্লাহ আমাদের কয়েকজনকে অনুগত সন্তান দান করবেন, কিংবা আমাদের কিছু সন্তান অনুগত হবে আবার কিছু সন্তান আমাদের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ হবে। আর আমাদের সব ধরনের সন্তানকেই বড় করে তুলতে হবে। এটা আমাদের দ্বীনেরই একটা অংশ, আমাদের জীবনের অংশ।

দু'টি বাচ্চা কখনোই একই রকমের হবে না। কেবল একটা সূত্র প্রয়োগ করে আমাদের সব বাচ্চাকে বড় করতে পারবো না। উদাহরণস্বরূপ ইয়াকূব-এর কথাই ধরি, আমরা এটা বিশ্বাস করি না যে তিনি ইউসূফ (আ:)-কে বেশী স্নেহ করেছিলেন এবং অন্যদের প্রতি কম যত্ন নিয়েছিলেন তাই তারা অমন আচরণ করেছিলো। তিনি একজন নাবী ছিলেন। অবশ্যই একজন নাবীর অন্যতম প্রধান কাজ হল ন্যায়নিষ্ঠভাবে জীবনযাপন করা। আর এতে সুবিচার হবে না আমি যদি আমার এক সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হই আর অন্য সন্তানের প্রতি তা না হই। আমরা ইয়াকুব (আ:)-এর কাছে এমনটা আশা করি না। অর্থাৎ বাবা হিসেবে যতটুকু করা সম্ভব ছিল তিনি করেছিলেন কিন্তু তারপরেও তাঁর সন্তানেরা তাঁকে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! শেষে তারাও তাওবা করেছিলেন আর এটা তার প্রতি আল্লাহর উপহার।

কিন্তু নুহ (আ:)-এর ক্ষেত্রে তাঁর ছেলে শেষ পর্যন্ত তাওবা করেনি। তিনি নাবী ছিলেন দেখে আমরা হয়ত ভাবতে পারি যে, তাঁর ছেলেকে মাফ করে দেয়া হবে এটা ঠিক নয়। বুঝার সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন-যিনি ভাল চাকরি করেন তার কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা থাকে। যেমন-হেলথ ইন্স্যুরেন্স, গাড়ি, টেলিফোন, বিভিন্ন রকম ভাতা ইত্যাদি। তাই নাবীর ক্ষেত্রে বিষয়টা একেবারেই এরকম নয়। নাবীর ছেলে হয়েছে বলেই আল্লাহর থেকে বাড়তি কোন সুযোগ-সুবিধাই সে পাবে না।

কোন নাবীকেই তাঁর পরিবারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি, না তাঁর স্ত্রী, না তাঁর সন্তান। এমনকি আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (স:)-এর ক্ষেত্রে। একটা হাদীসে আমরা দেখি যে তিনি যখন তার সন্তানের সঙ্গে কথা বলছেন... ফাতিমা তুষ যাহরা -এর সঙ্গে, তিনি বলছেন: "ফাতিমা, মুহাম্মাদের কন্যা। আল্লাহর ব্যাপারে সতর্ক হও, কারণ আল্লাহর সামনে আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না, তোমার উপরেও আমার কোন অধিকার থাকবে না!" তিনি এই কথা বলছেন নিজের মেয়েকে। অন্য কথায় তিনি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখাতে চাইছেন।

কেবল আমরা মুসলিম হয়েছি বলে, আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছি বলে... আমরা এমন সন্দেহ পোষণ করতে পারি না যে আমাদের নাবীজী এ তাঁর সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার চেয়ে কোন অংশে কম করেছেন। তিনি ভবিষ্যতের সকল বাবাদের জন্য আদর্শ। বিশেষ করে কন্যা সন্তানের বাবাদের জন্যে। আমাদের মধ্যে যাদের মেয়ে আছে আমরা তো অনুগৃহীত। আমরা সম্মানিত নাবী এ এর সুন্নাকে বহাল রাখতে পেরে। কারণ তিনিও ছিলেন কন্যা সন্তানের বাবা। তাঁর ছেলেও হয়েছিল কিন্তু তারা খুব অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিল। আল্লাহ তাকে একাধিক মেয়ে সন্তান উপহার দিয়েছিলেন এবং তাঁদের লালন-পালনের দায়িত্ব উপভোগ করতে দিয়েছেন। এটা এমন একটা দায়িত্ব যার জন্যে আমাদের সম্মানিত বোধ করা উচিত। এ কারণে মেয়ে সন্তান হওয়ার ব্যাপারে আমাদের চিন্তা ধারণা বদলে গিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ মেয়ে সন্তান হওয়ার যে কালচার ইসলামের পূর্বে এমনকি আরব দেশেও যখন মেয়ে সন্তান হত তখন তারা চেহারা বিকৃত করতেন: এহ! এখন আমি সমাজকে মুখ দেখাব কিভাবে। অবাক কথা এই যে, এই যুগে এসেও মুসলিম সমাজে কারো কারো পরিবারেই স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে আছেন। সে প্রায় মরেই যাচ্ছিল সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে কিন্তু সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর মা এস.এম.এস করলেন: 'ভালো খবর তো?' এ কথার মানে কি? তিনি আসলে জিজ্ঞেস করেছেন ছেলে হয়েছে কিনা। এরপর স্বামী কোন উত্তর না দিলে তিনি সান্তনা দিয়ে বলেন: অসুবিধা নেই, এর পরের বার হবে ইনশাআল্লাহ। যেন মেয়ে হওয়ার ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। সুবহানাল্লাহ। কত নীচে নেমে গিয়েছি আমরা।

আল্লাহ আসলে তাদের ব্যাপারে কুরআনে অভিযোগ করেছেন যারা তাদের কন্যা সন্তানকে মর্যাদা দেয় না। যখন মেয়ে জন্ম দেয় তার মুখ কালো হয়ে যায়। যেন কালোমেঘ তার মুখকে ঢেকে রেখেছে আর সে হতাশায় ডুবে ভাবছে আমার এই মাত্র একটা মেয়ে হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। তো আমাদের সন্তানদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করা নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের প্রথমে ভাবা উচিত মা-বাবা হিসেবে আমরা কতটা যোগ্য। এ বিষয়টা প্রথমে খেয়ালে আনতে হবে। আর এটা আসলে বেশ বড় একটা সমস্যা।

আমাদের মনে রাখতে হবে সন্তানের প্রতি সচেতনতা আমাদের দ্বীনের একটা ভিত্তি। দ্বীনের একটা মৌলিক অংশ। আলহামদুলিল্লাহ! সন্তানকে বড় করার কাজে আমরা বেশ ভালো যুগ যুগ ধরে। অবশ্যই পৃথিবী অনেক বদলে গিয়েছে নাবী (স:)-এর জন্মের পরে। কিন্তু সন্তান লালন-পালনে মুসলিমদের সফলতা অন্য কিছুর তুলনায় অনেক ভালো ছিলো বর্তমান সময়ের আগ পর্যন্ত। আজকের দুনিয়া এতটা আকস্মিকভাবে বদলে যাচ্ছে যে, এটা শুধু সরকার

কিভাবে পরিচালিত হবে তাতে প্রভাব রাখছে না। কিভাবে এক দেশ অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখছে, কিভাবে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠছে শুধু তাতেই প্রভাব বিস্তার করছে না বরং এটা আমাদের পরিবারগুলোকেও প্রভাবিত করছে। শুধু মুসলিম পরিবার নয়, সকল পরিবার।

বর্তমান বিশ্ব নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পরিবারের এখন যেমন অবস্থা দেখতে পাচ্ছি এর আগে কখনো এমনটা ছিল না। সন্তানদেরকে এমনভাবে বড় করা হচ্ছে ইতিহাসের আর কোন যুগে কিংবা অন্য কোন সংস্কৃতিতে এমন আকার ধারণ করেনি। শুধু মুসলিম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নয়, সবার ক্ষেত্রে। বিশ্বায়ন আর যোগাযোগ ব্যবস্থার বৃহৎ উন্নয়নের কারণে। তার উপর ভোগবাদের চরম পর্যায় সৃষ্টি হওয়ায় একে পুঁজিবাদ না বলে বরং বলা উচিত ভোগবাদ। আমরা পণ্যের আসক্ত ভোক্তায় পরিণত হয়েছি। আর এই মানসিকতা আমাদের ঘরের ভিতরেও প্রবেশ করে ফেলেছে।

একটা ছোট্ট উদাহরণ দেয়া যাক সে ব্যাপারে। আমাদের বাচ্চারা আমাদের কাছে কী নিয়ে সবচেয়ে বেশি আবদার করে? তারা কিসের জন্যে সব সময় বায়না ধরে বসে থাকে? চকলেট? না তারা এখন কেবল চকলেট চায় না! তারা এখন আইপ্যাড, প্লে স্টেশন ইত্যাদি চায়। তারা বড় হয়ে গিয়েছে? তারা এখন খেলনা দিয়ে খেলতে চায় না। তারা এসব আইপ্যাডের খবর কোথায় পায়? তারা কি স্বপ্নে দেখতে পায়? না। হয় তাদের বন্ধুর কাছে এসব আছে অথবা টিভিতে দেখেছে। তারা যখন দেখল তার অন্য বন্ধুদের এসব আঁছে তারা বলে আমি ওরকম স্নিকার চাই' 'আমি ওরকম শার্ট চাই' 'আমি ওরকম খেলনা চাই'।

এরকম খেলনার আইডিয়া তারা কোথায় পায়? এসবের ইলহাম কোথা থেকে আসে? এসব এসেছে মিডিয়া থেকে। আমরা আমদের বাচ্চাদের সামনে মিডিয়ার জগৎটা উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আর এই মিডিয়া, বাচ্চাদেরকে মূলতঃ এসব খেলনার জন্যে বায়না করতে শেখায়। যেন আমরা তাদের এসব খেলনা কিনে দেই। আর তখন আমরা এগুলো কিনি। তাছাড়া বাচ্চারাই যে এসবের একমাত্র শিকার তা কিন্তু নয়, আমরাও এর অন্তর্ভুক্ত। আমরা যেসব ব্রান্ডের ড্রেস পরি, তখন আমরা আসলে নিজেকে খুব হাই ক্লাস মানুষ ভাবতে শুরু করি যখন আমি একটা দামি ঘড়ি পরি। হঠাৎ যেন আমার মনে হতে থাকে সব মানুষের ভিড়ে আমার মান-মর্যাদা বেশী। যেই মুহূর্তে আমি একটা অ্যাপল স্টোর থেকে একটা আইফোন হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসি হঠাৎ যেন আমার নিজেকে খুব হ্যান্ডসাম লাগে! কিছু একটা তো হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না আমি কিভাবে এত কুল হয়ে গেলাম, এটা জাস্ট হয়ে গেল! আমরা

আসলে ভেবে নিই মানুষ হিসেবে আমাদের মর্যাদা বেড়ে গিয়েছে এসব পণ্যের ক্রেতা হয়েছি বলে।

আর আমি যদি কোনো ব্র্যান্ড-এর কাপড় না পরি, অথবা ওই ফোনটা যদি আমার না থাকে কিংবা আমার এই খেলনাটা নেই অথবা ওই খেলনাটা নেই তাহলে আমি মূল্যহীন। কোন কারণে আমি অন্যদের সমমান সম্পন্ন নই। অন্যরা আমার চেয়ে ভালো। শুধু এই কারণে যে, তাদের হাতে যেটা আছে সেটা আমারটার থেকে ভালো। তো আমরা মুসলিম আমরা কেমন যেন অচেতন ভোক্তায় পরিণত হয়ে গিয়েছি। এমনটাই আমাদের অবস্থা।

এই সমাজে সন্তান লালনের কথা বলার আগে আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, আর সারা দুনিয়াতে কী হচ্ছে? কার্যকর উপায়ে সন্তান লালনের কথা ভাবতে গিয়ে আমাদের এসব ব্যাপারে ভেবে দেখতে হবে। এটা একটা বড় সমস্যা। দ্বিতীয় বড় সমস্যা হল, আমার কাছে সাফল্যের মানে কি? কিসে আমাদের মর্যাদা বাড়ায়? এখনতো বাচ্চাদেরকে এই মানসিকতা দিয়ে বড় করা হচ্ছে যে তাদের মূল্য এই প্রোডাক্ট দ্বারা নির্ধারিত হয়... যে ব্রান্ডের কাপড় পরছে, যে বাসায় থাকছে, যে গাড়িটা চালিয়ে তাকে স্কুলে দিয়ে আসা হচ্ছে, যে ব্রান্ডের ব্যাগ কাঁধে নিচ্ছে, এসব ব্যাপার! এগুলোই আমাদের মূল্য যাচাই করছে। আর এর সাথে যোগ হয়েছে আরও একটা সমস্যা : জীবনে সফলতা বলতে কি বুঝায়?'

সাফল্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা ২০, ৩০, ৪০ বছর আগেও যা ছিল... মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশের জন্য ব্যাপারটা সত্য যে, আমাদের মধ্যে কারও কারও হয়ত শিক্ষার ভালো সুযোগ ছিল না, কিংবা আমাদের বাবা-মায়ের সুযোগ হয়নি। তো তারা তাদের সব ধরনের প্রচেষ্টা লাগিয়ে দেয় তাদের বাচ্চাকে শিক্ষিত করে তুলতে। আর আমি আমার জীবন থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি তাই আমি বলি 'আমি আমার বাচ্চার জন্য সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা রাখব'। যদিও এই ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে আমার তাকে প্রাইভেট স্কুলে পাঠাতে হয়, বাড়ি ভাড়া করতে হয়, অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে হয়, অস্বস্তিকর পরিবেশে থাকতে হয়, তারপরেও তাদের সুশিক্ষার স্বার্থে আমি তা করতে রাজি আছি। যদিও আমাকে অস্বাভাবিক লোন নিতে হয়... কেন? কারণ আমাদের কাছে সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ কি? আমাদের সন্তানদের সুশিক্ষা।

আর এখানে যারা আমাদের সন্তান, তাদেরকে বার বার বলা হয়েছে। তোমাকে শিক্ষা নিতেই হবে। তুমি একজন ব্যর্থ মানুষে পরিণত হবে যদি শিক্ষা না পাও। তোমাকে ডাক্তার হতে

হবে, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, এটা পাস করতে হবে, ওটা পাস করতে হবে ইত্যাদি। এখন আমার জন্য কেবল একটাই দরজাই খোলা আছে আর সেটা হলো আখিরাত। কারণ আমি ডাক্তার হতে পারিনি দেখে আমার মা-বাবা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। তবে খেয়াল করি ডাক্তার হওয়া আমাদের একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? কারণ নাম ও টাকা। এজন্যে না যে আমি কারও জীবন বাঁচাতে পারছি কিংবা মানবতার সাহায্য করছি। এ ধারণার সাথে ডাক্তার হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই!

আমাদের মাঝে কোন উৎসাহ নেই নিজেদের সন্তানকে উদ্ধারকর্তা হিসেবে দেখার। মা-বাবা খুব খুশি হয়ে যায় যখন দেখে ছেলে ডাক্তার হয়ে ফিরছে। কিন্তু ছেলে যদি বলে 'আমি তিন বছরের জন্য ওয়াল্ড ভিশন এনজিওতে ভলান্টিয়ার কাজ করবো। আমি বাংলাদেশের বন্যা কবলিত এলাকায় যাবো, এরপর আমি আফ্রিকা যাবো তারপর ফিলিস্তিনিদের সাহায্যার্থে যাবো, আমি শুধু সেবা দান করব, এই তিন বছর বেতন নিব না, কোন লাভের জন্য কাজ করব। না, শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানব সেবা করব।' তখন সেই মা-বাবা বলবে "ইয়া আল্লাহ। আমরা আমাদের সব টাকা পয়সা ঢেলে দিয়েছি তোমাকে ডাক্তার বানাবার জন্যে আর এখন তুমি এসব করবে? নিজের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াবে? তুমি কেন বিনা পারিশ্রমিকে অসহায় মানুষদের জীবন বাঁচাবে? তোমার সমস্যা কি?" এই হলো আমাদের বাস্তব চিত্র।

এদিকে আমরা ভাবি আমাদের ছেলেমেয়েদের মাঝে ঝামেলা আছে। আমাদের কুচিত আয়নায় আমাদের নিজেদের দেখা। আমরা আসলে কাদের তৈরি করছি? কোন একটা ব্যাপার একদম গোড়া থেকে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আমাদের কাছে সাফল্য হলো টাকা-পয়সা। শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা হলো এমন একটা ক্যারিয়ার যাতে অনেক টাকা আসে। সবকিছুর মূলেই অর্থ-সম্পদ। আমি যদি সফল হই, এর মানে এই যে, আমার অনেক টাকা আছে। আমি যদি সফল হই, এর মানে এই যে, আমি শিক্ষা অর্জন করেছি, কিন্তু শিক্ষা অর্জন করেছি কোন ফিল্ডে? যেখানে আমার একটা ভালো ক্যারিয়ার হবে, যার মানে যেখানে আমি অনেক টাকা পয়সা পাবো। এটাই এখন সাফল্যের সংজ্ঞা।

সবশেষে কথা একই। এই ধারণা আগের যুগ থেকে ভিন্ন। আগে সকলের ধারনা ছিলো আমি শিক্ষিত হয়েছি এর মানে হচ্ছে আমি নিজেকে বুঝি, আমার চারপাশের পরিবেশকে বুঝি, আর আমি পৃথিবীকে আরও সুন্দর বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কাজ করছি। আর এর জন্য কখনো আমাকে ইতিহাস পড়তে হবে, কখনো সামাজ বিজ্ঞান পড়তে হবে, কখনো

পলিটিক্যাল সাইন্স পড়তে হবে, কখনো সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশুনা করতে হবে। কেবল একটা ক্ষেত্র নিয়েই পড়ে থাকলে চলবে না। আর তাছাড়া যে দিক থেকেই বিচার করি না কেন, সবচেয়ে সফল কমিউনিটি হলো তারাই যারা নিজেদের ছেলেমেয়েকে কেবল একটা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেনি।

এখন সন্তান বড় করা সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বলা যাক। সবচেয়ে আগে আমাদের মানসিকতা বদলাতে হবে। তারা যদি আমাদের মাঝে সফলতার সঠিক সংজ্ঞা খুঁজে না পায়, তারা যদি আমাদের ব্যক্তিত্বে এর প্রতিফলন না দেখতে পায়, আমাদের দৈনিক কথাবার্তায়, তবে আমরাও এটা আশা করতে পারি না যে তারা সফলতার সঠিক মানে নিজে থেকে বুঝে নিয়েছে। তাদের কাছে এ নির্দেশনা আমাদের পক্ষ থেকেই আসতে হবে। আমরা যা নিয়ে সব সময় কথা বলি, আমাদের কাছে যে বিষয়গুলো সব সময় গুরুত্বপূর্ণ, যখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে কথা বলি তখন বাচ্চা তা শুনতে থাকে, তাই না? তাদের কান সবসময় খোলা থাকে। এখন আমরা যদি বিল ফাঁকি দেয়া নিয়ে কথা বলি, বাড়িওয়ালা বা ভাড়াটিয়ার বদনাম করি কিংবা আমরা সবসময় নাটক-সিনেমা নিয়ে কথা বলি কিংবা অন্য পরিবার সম্পর্কে কেবল বাজে কথা বলি, তারা কি করে না করে, এসব আলাপ-আলোচনা করি। তারা ভেবে নিবে যে বড়রা এমনই, আমার মা-বাবা এসব করে। এগুলো তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু আমি আর আমার স্ত্রী যদি কুরআন নিয়ে কথা বলি, আখিরাত নিয়ে কথা বলি, অন্যের জন্য ভালো কিছু করার কথা বলি, কাউকে সাহায্য করার কথা বলি, তারা আমারটা দেখে শিখে নিবে। আমার তাকে লেকচার দিতে হবে না এ ব্যাপারে, তারা কেবল আমাকে দেখবে। সবচেয়ে কার্যকর প্যারেন্টিং সেটাই যেখানে বাচ্চাকে কোন কাজ করাতে মা-বাবার কিছু বলতে হয় না, তারা মা-বাবাকে দেখে দেখে শিখে ফেলে। কারণ তারা এসবই সব সময় দেখেছে।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১. সন্তান স্বপ্নের পরিচর্যা - (মির্জা ইয়াওয়ার বেইগ)
২. শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা- (ড. আইশা হামদান)
৩. প্যারেন্টিং-(আমির জামান, নাজমা জামান)
৪. নেক সন্তান গড়বেন যেভাবে- (মুহাম্মদ সালিহ আল- মুনাজ্জিদ)